।।শ্রীহরি।।
1305
প্রশ্নোত্তর মণিমালা
प्रश्नोत्तरमणिमाला (बँगला)
गीताप्रेस गोरखपुर
GITA PRESS, GORAKHPUR
স্বামী রামসুখদা

1305

॥ শ্রীহরিঃ ॥

প্রশ্নোত্তর-মণিমালা

(বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচশোটি প্রশ্ন-উত্তর)

प्रश्नोत्तर-मणिमाला (बँगला)

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥

স্বামী রামসুখদাস

1305 Prasanotar manimala (Bangala)_Section_1_Front

Books are also available at–

1. **Gobind Bhavan**
   151, Mahatma Gandhi Road, Kol- 7
   Phone : 2268-6894 / 0251
2. **Howrah Station**
   (a) Opposite to 1-2 P.F. & Ticket counters.
   (b) (P.F. No. 23) New Complex
3. **Sealdah Station** (Near Main Enquiry)
4. **Kolkata Station**
   (P.F. No.1, Near Over Bridge)
5. **Asansol Station**
   (P.F. No.5, Near Over Bridge)
6. **Kharagpur Station**
   (P.F. No. 3)
7. **Dum Dum Station**
   (P.F. No. 2/3)

Eighteenth Reprint 2021 2,500

Total 74,500

❖ **Price : ₹ 20**

(Twenty Rupees only)

कूरियर/डाकसे मँगवानेके लिये
गीताप्रेस, गोरखपुर—273005
book.gitapress.org
gitapressbookshop.in

Printed & Published by :

Gita Press, Gorakhpur
(a unit of Gobind Bhavan-Karyalaya, Kolkata)

Phone: (0551) 2334721, 2331250, 2331251

web:**gitapress.org** e-mail:**booksales@gitapress.org**

1305 Prasanotar manimala (Bangala)_Section_1_Back

অনুবাদকের কথা

'প্রশ্নোত্তর-মণিমালা' গ্রন্থটি পারমার্থিক বিষয়ে স্বামী রামসুখদাসকৃত পাঁচশোটি প্রশ্ন ও উত্তরের সংকলন। বর্তমান সময়ে আধ্যাত্মিক জগতে স্বামী রামসুখদাস এক অতি সুপরিচিত নাম। অধ্যাত্ম সাধনায় সাধারণত তিনটি পথ বা মার্গের কথা বলা হয়, এগুলিকে যোগও বলে। যথা জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, এবং ভক্তিযোগ। আবার ঈশ্বর সম্বন্ধেও বলা হয়— তিনি নির্গুণ-নিরাকার, সগুণ-সাকার এবং সগুণ-নিরাকার। প্রচলিত কথায় জ্ঞানযোগীরা অদ্বৈতবাদী, তাঁদের কাছে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। অন্যদিকে ভক্তিযোগীরা পরিপূর্ণভাবে দ্বৈতবাদী। তাঁদের কাছে ভগবান এবং ভক্ত—দুই পৃথক সত্তা। স্বামী রামসুখদাস ভক্তিযোগের ধারায় 'প্রেম'কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেও তাঁর লেখনীর মধ্যে জ্ঞানযোগের দ্যুতিও অমলিন। বর্তমান গ্রন্থে প্রথম প্রশ্ন 'অর্পণ করার তাৎপর্য কী'— এর উত্তরে তিনি বলেছেন 'আমিত্ব' ত্যাগ করা। আর শেষ প্রশ্ন 'শেষ কথা কী' — এর উত্তরে বলেছেন 'এক চিন্ময় সত্তা ছাড়া আর কিছুই নেই'। সেই চিন্ময় সত্তার কাছেই নিজেকে অর্পণ করতে হবে নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে বিলীন করে। এখানে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের এক মিলন লক্ষ্য করা যায়।

বস্তুত পারমার্থিক সাধনার ক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রধান কথাই হলো 'আছি'কে ভুলে গিয়ে 'আছে'-কে গ্রহণ করা। এই কাজ আয়াসসাধ্য মনে হলেও অসম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন নিরন্তর সচেতনতা এবং অকৃত্রিম আকুলতা। স্বামীজী এই কথাই বলতে চেয়েছেন এখানে এবং আরও অনেক গ্রন্থে। তাঁর কথার অনেকগুলি ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশিষ্টতা আছে। পুরাতন সংস্কারে আবদ্ধ মানুষের মনকে সেগুলি নিশ্চয় নাড়া দেবে। তবু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে **'প্রশ্নোত্তর-মণিমালা'** থেকে অনেকেই তাঁদের সংশয়ের সমাধান খুঁজে পাবেন।

বাংলা বইটি মূল হিন্দী থেকে অনূদিত হয়েছে।

মকর সংক্রান্তি ১৪০৭ **ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ॥

প্রাক্‌কথন

কৃষ্ণো রক্ষতু নো জগৎ ত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণং নমস্যাম্যহং
কৃষ্ণেনামরশত্রবো বিনিহতাঃ কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ॥
কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণস্য দাসোস্ম্যহং
কৃষ্ণে তিষ্ঠতি সর্বমেতদখিলং হে কৃষ্ণ সংরক্ষ মাম্ ॥

(মুকুন্দমালাস্তোত্র)

প্রশ্নোত্তরের পরম্পরা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই চলে আসছে। সৃষ্টির আদিকালে যখন ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েছিলেন তখন সর্বপ্রথম তাঁর ভিতর এই প্রশ্ন উদিত হয়েছিল—'***ক এষ যোঽসাবহমব্জপৃষ্ঠ এতৎকুতো বাব্জমনন্যদপ্সু***' (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৮।১৮) 'এই কমলের কর্ণিকার উপর উপবিষ্ট আমি কে ? এই কমলও অন্য কোনো আধার ছাড়া জলে কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে ? ' 'আমি কে' আর 'এটি' কী ? এটিকে সৃষ্টির আদি প্রশ্ন বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রবুদ্ধ জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নগুলির উত্তরে অদ্যাবধি কত গ্রন্থই না রচিত হয়েছে। জগন্মাতা পার্বতীর প্রশ্ন এবং আশুতোষ শংকরের উত্তরের ফলস্বরূপ জগতে বিবিধ লৌকিক এবং অলৌকিক বিদ্যাগুলি প্রকটিত হয়েছে, বিবিধ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। শৌনকাদি ঋষিদের গ্রন্থ এবং সূতজীর উত্তর থেকে আঠারটি পুরাণ তৈরি হয়েছে। কেনোপনিষদ্ এবং প্রশ্নোপনিষদ্—এই দুটি উপনিষদের রচনা প্রশ্নকে নিয়েই হয়েছে। শ্রীমৎশংকরাচার্য দ্বারা রচিত **'প্রশ্নোত্তরী'** সুপ্রসিদ্ধ ।

সাধারণত বাল্যাবস্থা থেকেই শিশুদের জিজ্ঞাসু হৃদয়ে প্রশ্ন উত্থিত হতে থাকে। কিন্তু যখন মানুষ পারমার্থিক পথে পদক্ষেপ করে তখন তার ভিতর ক্রমশ নানা ধরনের প্রশ্ন উঠতে থাকে এবং সে এমন সন্ত বা

গুরুর সন্ধান করতে থাকে যিনি তার প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিয়ে তাকে সঠিক মার্গদর্শন করাতে পারবেন। ভগবান গীতায় বলেছেন-

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

(গীতা ৪।৩৪)

'সেই তত্ত্বজ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে গিয়ে বোঝ। তাঁকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করলে, তাঁর সেবা করলে এবং সরলতার সঙ্গে প্রশ্ন করলে সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাপুরুষ তোমার সেই তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ দেবেন।'

'**জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ**' বলার তাৎপর্য হলো এই যে, সাধকের প্রশ্নের সঠিক উত্তর সেই মহাপুরুষই দিতে পারেন যাঁর শাস্ত্রের জ্ঞানও আছে এবং তত্ত্বের অনুভূতিও আছে। তার কারণ কেবল শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তত্ত্বের অনুভূতি নেই এমন লোকের কথায় তেমন জোর থাকে না যার দ্বারা সাধকের বোধ উদয় হয়। যদি তত্ত্বের অনুভূতি থাকে, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান না থাকে তাহলে তিনি সাধকের বিভিন্ন প্রশ্নের সপ্রমাণ উত্তর দিতে পাববেন না। কিন্তু এমন মহাপুরুষ খুবই দুর্লভ। এজন্য অখিল সৌন্দর্যমাধুর্যরসামৃতসিন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে একথা বলে ভীষ্মপিতামহের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন যে জ্ঞানের সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছেন। অর্থাৎ পিতামহ তাঁর শরীর ত্যাগ করে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এজন্য তোমার যদি কিছু প্রশ্ন করার থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি করে নাও——

তস্মিন্নস্তমিতে ভীষ্মে কৌরবাণাং ধুরন্ধরে।
জ্ঞানান্যস্তং গমিষ্যন্তি তস্মাৎ ত্বাং চোদয়াম্যহম্॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব ৪৬।২৩)

সাধনমার্গে প্রশ্নোত্তরের খুবই গুরুত্ব আছে। প্রশ্ন না করে কোনো কথা যদি সাধক পান তাহলে তার প্রতি তাঁর বিশেষ মন যায় না। কিন্তু

সাধক যখন নিজে প্রশ্ন করেন তখন তার উত্তরে তিনি যে কথা পান তা সাধকের হৃদয়ে গেঁথে যায়। কঠিনতম আধ্যাত্মিক বিষয়ও প্রশ্নোত্তরের দ্বারা সরল হয়ে যায়। যদি কেউ প্রকৃত জিজ্ঞাসু হন তাহলে তাঁর দ্বারা উত্থিত প্রশ্নে সন্তদের হৃদয়ে নতুন নতুন বিশেষ ভাব প্রকাশ হতে থাকে। সেই ভাব কেবল প্রশ্নকর্তার জন্যই নয়, বরং সমগ্র সংসারের পক্ষে হিতকারী।

যতক্ষণ পর্যন্ত সাধকের দৃষ্টিতে অন্য (জগতের) সত্তা থাকে, ততক্ষণ তার ভিতর একের পর এক প্রশ্ন উঠতে থাকে। তার কারণ হলো অন্য সত্তা মেনে নিয়েই প্রশ্নোত্তর বা শংকা সমাধান হয়ে থাকে **'চোদ্যং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া'**। যখন তার দৃষ্টিতে এক চিন্ময় সত্তা ছাড়া আর কিছু থাকে না তখন তার সকল সংশয় দূরীভূত হয়—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে॥

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।২।৮)

'সেই পরমাত্মতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি যেতেই হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি ছিন্ন হয়ে যায়, সকল সংশয় দূর হয়ে যায় এবং সমগ্রকর্ম ভস্মীভূত হয়ে যায়।'

বস্তুত তত্ত্ব বর্ণনাতীত। সেখানে মন-বুদ্ধি-বাণী পৌঁছতে পারে না—***'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'*** (তত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৯), ***'মন সমেত জেহি জান ন বানী'*** (শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ৩৪১।৪)। এজন্য সব কিছুর বর্ণনা (প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি) প্রকৃতির অন্তর্গত হয়ে থাকে এবং শাখাচন্দ্রন্যায়ের মতো পরমাত্মতত্ত্বের কেবল সংকেত করা হয়। বর্ণনার দ্বারা বোধ হয় না বরং তার দ্বারা শেখা হয়। যেখানে বর্ণনা আছে সেখানে তত্ত্ব নেই, আর যেখানে তত্ত্ব আছে সেখানে বর্ণনা নেই। যাঁরা বর্ণনার মধ্যেই জড়িয়ে পড়েন সেই সব মানুষ তত্ত্ব লাভ করেন না। এইসব মানুষ শুধু মুখেই জ্ঞানী। কিন্তু যাঁরা

সত্যকার জিজ্ঞাসু তাঁরা বর্ণনার মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে তার লক্ষ্য (তত্ত্ব)-এর দিকে দৃষ্টি দেন তাঁরা বর্ণনাতীত তত্ত্ব পেয়ে যান।

প্রত্যেক সাধকের তাঁর প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য প্রচণ্ড ক্ষুধা থাকে। সাধনা করবেন কিন্তু প্রশ্ন জাগবে না—এ অসম্ভব। এজন্য যখন সাধক কোনো ভালো, সন্তোষজনক উত্তরদাতা পেয়ে যান তখন তিনি খুবই উৎসাহিত হন। শ্রীমৎভাগবতে আছে, উদ্ধব যখন দেখলেন যে ক্ষরাক্ষরাতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রশ্নের উত্তর খুব সুচারু রূপে দিচ্ছেন তখন তিনি প্রশ্নের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন এবং একসঙ্গে পঁয়ত্রিশটি প্রশ্ন করে ফেলেছিলেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৯।২৮-৩২)। এই রকমের কথা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীজী শ্রীরামসুখদাস মহারাজের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। তিনি তাঁর প্রবচনে নানা রকম প্রশ্নের উত্তর এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতিতে দেন যে শ্রোতারা উৎসাহিত হয়ে প্রশ্নের বন্যা বইয়ে দেন। সৎসঙ্গের সময় শেষ হয়ে যায় কিন্তু শ্রোতাদের দিক থেকে প্রশ্ন আসা শেষ হয় না। এর কারণ হলো এই যে, তিনি প্রশ্নের উত্তর সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে না দিয়ে প্রশ্নকর্তার ভাবের দৃষ্টিতে দেন। এজন্য তাঁর কথা শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রত্যেক প্রশ্নকর্তার সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। তিনি প্রতিটি প্রশ্নকর্তাকে—সেই প্রশ্নকর্তা যে কোনো বিষয়ে যে কোনো ধরনের প্রশ্নই করুন না কেন তাঁকে নিজের উত্তরের দ্বারা সন্তুষ্ট করে দেন। তিনি প্রায় উনিশ বছর বয়স থেকেই ভাগবৎভাবের প্রচার এবং সাধকদের শংকা সমাধানের কাজ আরম্ভ করেছিলেন এবং এখন ছিয়ানব্বই বছর বয়স পার করে দিয়েও সমান উৎসাহে বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রবচনের দ্বারা সাধকদের নানা রকম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাঁদের পথ প্রদর্শন করছেন।

পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীজী মহারাজকে আমি অনেক বছর ধরে মাঝে মাঝে নানা রকম প্রশ্ন করে এসেছি। প্রায় কুড়ি বছর ধরে ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করা সেই প্রশ্নোত্তরের মধ্য থেকে সর্বাপেক্ষা উপযোগী পাঁচশো প্রশ্ন

বেছে নিয়ে **'প্রশ্নোত্তর-মণিমালা'** গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে এমন প্রশ্নও আছে যা অন্যের কথা এবং উপযোগী মনে করে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য প্রশ্নোত্তরগুলিকে বিষয়ানুসারে বিভাজন করা হয়েছে।

পরমশ্রদ্ধেয় স্বামীজী শ্রীরামসুখদাস মহারাজের আরও কয়েকটি গ্রন্থ গীতা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে যা প্রশ্নোত্তর রূপে লিখিত হয়েছে। যেমন, আদর্শ গার্হস্থ জীবন, ঈশ্বরকে মানব কেন ? সত্যকার গুরু কে ? নামজপের মহিমা, মূর্তিপূজা, দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া, সন্তানের কর্তব্য, আহার-শুদ্ধি প্রভতি। পাঠকদের এইসব গ্রন্থও অবশ্যই অধ্যয়ন করা উচিত।

পাঠকদের কাছে বিনম্র নিবেদন হলো এই যে, তাঁরা যেন এই গ্রন্থে উপস্থাপিত শ্রেষ্ঠ কথাগুলিকে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীস্বামীজী মহারাজের কৃপাপ্রসাদ মনে করে নিজেদের জীবনে ধারণ করেন এবং ত্রুটিগুলিকে আমার ব্যক্তিগত ভ্রম মনে করে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করেন।

সন্তের উচ্ছিষ্ট উক্তিই হলো আমার বানী
কী জানি তার মাঝে আছে কোন্ ভুল, আমি অজ্ঞানী॥

শ্রীরামনবমী
বিক্রম সংবত ২০৫৭
(তদনুসারে বাংলা ১৪০৭)

নিবেদক
রাজেন্দ্রকুমার ধবন

বিষয়ানুক্রমণিকা

॥ শ্রীহরিঃ ॥

প্রশ্নোত্তর-মণিমালা

অর্পণ

প্রশ্ন—অর্পণ করার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—আমিত্ব ত্যাগ করা।।১ ॥

প্রশ্ন—ভগবানকে সব কিছু অর্পণ করার পর পূর্ব সংস্কারবশে নিষিদ্ধ কর্ম কি করা যায় ?

উত্তর—না, করা যায় না॥২ ॥

প্রশ্ন—ভুল করেও কি এমন অহঙ্কার হওয়া সম্ভব যে আমি প্রভুকে সব কিছু অর্পণ করেছি ?

উত্তর—না, সম্ভব নয়। যদি এমন অহঙ্কার থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে সম্পূর্ণ সমর্পণ হয়নি। ভ্রান্তিবশে যে বস্তু সমূহকে নিজের বলে মানা হয়েছিল সেই ভুল যখন দূর হয়েছে তাহলে অহঙ্কার কেমন করে হবে ? ॥৩ ॥

প্রশ্ন—সর্বস্ব অর্পণ করলে গুণের সঙ্গে দোষগুলিও কি সমর্পিত হয়ে যাবে, যেমন বাড়ি বিক্রয় করলে সেখানেকার বসবাসকারী সাপ-বিছাও চলে যায় ?

উত্তর—আগুনে যা কিছু ঢালা যায় তা সবই পুড়ে গিয়ে অগ্নিময় হয়ে যায়। এজন্য গীতায় বলেছে—

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ (৯।২৮)।

এইভাবে অর্পণ করলে তুমি কর্মবন্ধন থেকে এবং শুভ (বিহিত) এবং অশুভ (নিষিদ্ধ) সকল কর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি (গীতা ১৮।৬৬)।

আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেব॥৪ ॥

~~0~~

অবতার

প্রশ্ন—অংশাবতার কী ?

উত্তর—ভগবানের শক্তি অনন্ত। সেই অনন্ত শক্তির একটি অংশ অবতীর্ণ হলে অংশাবতার বলা হয়॥৫॥

প্রশ্ন—ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভগবানের অবতার লীলায় একই লীলাসহচর থাকে, নাকি তাদের বদল ঘটে ?

উত্তর—প্রয়োজন হলেই ভগবান অবতার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর লীলার সহচরগণ বদলাতে থাকে। যেমন, রামলীলায় সব সময় একজন পাত্রই কাজ করেন না, তাঁর বদলও হয়॥৬॥

প্রশ্ন—কৃষ্ণাবতার সব অবতার থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কেন ?

উত্তর—কৃষ্ণাবতারে প্রেমের প্রাধান্য। অন্য অবতারদের মধ্যেও প্রেমের অভাব নেই। কিন্তু সেগুলিতে প্রেমই মুখ্য নয়॥৭॥

প্রশ্ন—আমরা জানি ভগবান অবতার হয়ে লীলা করেন। অন্য দিকে সংসারে যা কিছু হচ্ছে সেই সবই ভগবানের লীলা। দুটির মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

উত্তর—অবতারের লীলা স্থানবিশেষে হয় এবং তাতে ভগবৎ ভাব প্রধান থাকে। ঘটমান লীলা সর্বজনীন এবং তাতে ভক্তের ভাবই প্রধান॥৮॥

প্রশ্ন—ভগবান তো যুক্তযোগী। তাহলে অবতারকালে তা বুঝা যায় না কেন ?[১]

উত্তর—এর প্রধান কারণ হলো এই যে, অবতারকালে ভগবান মানুষের

---

[১]যাঁরা সাধনার দ্বারা সিদ্ধ হন সেই রকম মহাপুরুষদের 'যুঞ্জান যোগী' বলা হয়। সাধনা করতে করতে তাঁদের শক্তি এতো বর্ধিত হয় যে, যেখানেই তাঁরা বৃত্তি নিয়োগ করেন সেখানকার জ্ঞান তারা লাভ করেন। কিন্তু ভগবানকে 'যুক্তযোগী' বলা হয়। তিনি সাধনা ছাড়াই স্বতঃসিদ্ধ, নিত্যযোগী। জানবার জন্য তাঁকে বৃত্তি নিয়োগ করতে হয় না। অধিকন্তু তাঁর মধ্যে সব কিছুর জ্ঞান সর্বদা স্বতঃ স্বাভাবিক থাকে। তিনি অভ্যাস ব্যতিরেকেই সর্বদা সব কিছু জানেন।

মতো লীলা করেন। তিনি কখনও মাধুর্যের লীলা করেন, কখনও ঐশ্বর্যের॥৯॥

~~○~~

অহং

প্রশ্ন—অহংকে করণও বলা হয়েছে, কর্তাও বলা হয়েছে। করণ কেমন করে কর্তা হতে পারে ?

উত্তর—বাস্তবে অহং হলো করণ। আমরাই তাকে কর্তা মনে করি—**'কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)॥১০॥

প্রশ্ন—আমিত্বকে যখন ভুল করে মানা হয়েছে তাহলে এই ভুল আছে কার মধ্যে ?

উত্তর—যারা তাকে মেনেছে। যারা পরিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করেছে, তাদের মধ্যে আছে। এই ভুল অনাদি, কিন্তু এর অবসান হয়॥১১॥

প্রশ্ন—মন, বুদ্ধি এবং অহং-এর সংস্কার কী করে দূর হবে ?

উত্তর—মন, বুদ্ধি এবং অহং-কে বিরক্ত করো না। সেগুলির দিকে তাকিও না। কেবল 'অস্তি' কে দেখ। পরিচ্ছিন্নতা দূর হবে—এই দিকেও লক্ষ্য রাখবে না, কোনো দিকেই তাকিও না। চুপ করে থাক। তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। সমুদ্রে যদি বরফের ঢেলা ভাসতে থাকে তাহলে তাকে গলাতে হবে না, রাখতেও হবে না। একেই সহজাবস্থা বলে॥১২॥

প্রশ্ন—অহং-রূপ অণুকে ভাঙ্গা কেন কঠিন মনে হয় ?

উত্তর—সংশ্রব জনিত সুখের প্রতি আকাঙ্ক্ষার ফলে আমিত্ব দূর হওয়া কঠিন মনে হয়। বেঁচে থাকি এবং সুখ সুবিধা নিয়ে বাঁচি—এর উপরেই আমিত্ব প্রতিষ্ঠিত॥১৩॥

প্রশ্ন—আমি জ্ঞানী এবং আমি ভক্ত—দুটিতেই অহং ভাব সমানভাবে বিদ্যমান। তাহলে প্রভেদ কোথায় ?

উত্তর—প্রভেদ হলো ভক্তিতে ভগবান হলেন সহায়, কিন্তু জ্ঞানে কে সহায় ? ভগবান সহায় থাকায় ভক্তের মধ্যে যদি কিছু ন্যূনতা থাকে তবুও

পতন হয় না[১]॥১৪॥

প্রশ্ন—অহঙ্কারশূণ্য নিষিদ্ধ কর্ম হওয়া এবং অহঙ্কারযুক্ত শুভকর্ম হওয়া—এই দুটির মধ্যে কোনটি ঠিক ?

উত্তর—অহঙ্কার-শূন্য হলে তো কোনো কর্মবন্ধনই স্পর্শ করে না[২], কিন্তু অহঙ্কারকে রেখে শুভকর্ম করলে তাও বন্ধনকারী হয়ে যায়॥১৫॥

~~○~~

আনন্দ

প্রশ্ন—সাত্ত্বিক সুখ, শান্তি এবং আনন্দের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

উত্তর—চিন্ময়তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে কীর্তন প্রভৃতিতে সাত্ত্বিক সুখ পাওয়া যায়। সাত্ত্বিক সুখ ভোগ না করলে শান্তি পাওয়া যায়। শান্তিও উপভোগ না করলে পরম আনন্দ পাওয়া যায়।

সাত্ত্বিক সুখ গুণ যুক্ত কিন্তু শান্তি এবং আনন্দ গুণাতীত।

সংসারে ত্যাগে শান্তি এবং পরমাত্মার লাভে আনন্দ পাওয়া যায়॥১৬॥

প্রশ্ন—সাংসারিক সুখ এবং পারমার্থিক আনন্দে কী পার্থক্য ?

উত্তর—সাংসারিক সুখ দুঃখের প্রত্যাশায় থাকে অর্থাৎ সাংসারিক সুখের সঙ্গে দুঃখও যুক্ত, কিন্তু আনন্দ নিরপেক্ষ। তার সঙ্গে দুঃখের মিশ্রণ নেই।

---

[১]বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৮)

হে উদ্ধব ! আমার যেসব ভক্ত এখনও জিতেন্দ্রিয় হতে পারেনি এবং সংসারের বিষয়গুলি যাদের কাছে বাধা হয়, নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে, তারাও প্রতি মুহূর্তে ক্রমবর্ধমান আমার প্রতি ভক্তির প্রভাবে প্রায়ই বিষয়ের দ্বারা পরাজিত হয় না।

[২]যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবদ্ধতে॥ (গীতা ১৮।১৭)

'যার মধ্যে অহংভাব ('আমি কর্তা'- এরকম ভাব) নেই এবং যার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সে যুদ্ধে এই সব প্রাণীকে মেরে ফেললেও মারে না এবং আবদ্ধ হয় না।'

সাংসারিক সুখে বিকার আছে, কিন্তু আনন্দ নির্বিকার। সাংসারিক সুখ বিষয়েন্দ্রিয় সংশ্রব জনিত, কিন্তু আনন্দ সংশ্রব জনিত নয়। সাংসারিক সুখে কেবলই চাকচিক্য, কিন্তু আনন্দে তা নেই ; তা সম, একরসযুক্ত, শান্ত, নির্বিকার। তাৎপর্য হলো বিকার, দুঃখ, পরিবর্তন, ন্যূনতা, চঞ্চলতা, বিক্ষেপ, বৈষম্য, পক্ষপাত ইত্যাদি না থাকা হলো আনন্দ।

আনন্দ দুই প্রকারের হয়—অখন্ড আনন্দ (নিজানন্দ) এবং অনন্ত আনন্দ (পরমানন্দ)। মুক্তির আনন্দ হলো অখন্ড আনন্দ এবং প্রেমের আনন্দ হলো অনন্ত আনন্দ। অখন্ড আনন্দ সম, শান্ত, একরসযুক্ত হয়ে থাকে এবং অনন্ত আনন্দ প্রতি মুহূর্তে বর্ধিত হতে থাকে। অতএব প্রেমের আনন্দ মুক্তির আনন্দ থেকে খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মুক্তিতে তো কেবল সাংসারিক দুঃখই দূর হয় আর স্বয়ং যেমনকার তেমনই থাকে। কিন্তু প্রেমে স্বয়ং-এর নিজস্ব অংশ পরমাত্মার প্রতি আকর্ষণ থাকে।

যদি সাধক নিজের আগ্রহ না রাখেন তাহলে শান্ত রস অখন্ড রসে এবং অখন্ড রস অনন্ত রসে নিজে থেকেই লীন হয়ে যায়॥ ১৭॥

প্রশ্ন—সৎ (নিজের সত্তা)- এর অভিজ্ঞতা তো সকলেরই হয়ে থাকে। কিন্তু চিৎ এবং আনন্দ-এর অভিজ্ঞতা সকলের হয় না। এর কারণ কী ?

উত্তর—সৎ অপেক্ষা চিৎ স্থূল এর চিৎ অপেক্ষা আনন্দ স্থূল। সৎ যত ব্যাপক, চিৎ ততটা নয়। আর চিৎ যত ব্যাপক আনন্দ ততটা নয়। সেজন্য সৎ-এর যেমন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে তেমন অভিজ্ঞতা চিৎ-এর হয় না। আবার চিৎ-এর যতটা অভিজ্ঞতা হয় সেরকম আনন্দের হয় না। চিৎ এবং আনন্দে লৌকিক চিৎ এবং আনন্দও এসে যায়। তাই সাধারণ মানুষেরা ক্রিয়াশীল বস্তুকে চেতন এবং লৌকিক সুখকে আনন্দ মনে করে।

সৎ সর্বত্র প্রকট, চিৎ জীবের মধ্যে প্রকট এবং আনন্দ তত্ত্বজ্ঞানীতে প্রকট থাকে॥ ১৮॥

~~~o~~~

কর্তব্য -কর্ম

প্রশ্ন—কর্মের উপযোগিতা কী ?
~~~

উত্তর—সংসার থেকে উপরে উঠবার জন্য, নিষ্কামভাবে অন্যের কল্যাণের জন্য কাজ করবার প্রয়োজন আছে। কেননা সকামভাবে নিজের জন্য কিছু করলেই মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয়। অতএব কর্মের বেগ এবং বর্তমানের আসক্তির (সংসারের আকর্ষণ) নিবৃত্তির জন্য কর্ম করবার উপযোগিতা আছে—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। (গীতা ৬।৩)॥১৯॥

প্রশ্ন—কর্তব্য পালনকে কেন কঠিন মনে হয় ?

উত্তর—কর্তব্য তাকেই বলে যা করা যায় এবং যা করা উচিত। যা করা উচিত নয় তা কর্তব্য নয়। অতএব কর্তব্য পালন সর্বাপেক্ষা সহজ। অ-কর্তব্যের প্রতি আসক্তির কারণেই কর্তব্য পালন কঠিন মনে হয় ॥২০॥

প্রশ্ন—কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান না হওয়ার কারণ কী ?

উত্তর—পক্ষপাত, বৈষম্য, মমতা, আসক্তি, অহঙ্কার থাকলে কর্তব্য-অকর্তব্যের সুষ্ঠু জ্ঞান হয় না॥ ২১ ॥

প্রশ্ন—নিষ্কামভাব রেখে আহার করলেও তৃপ্তিরূপ ফল তো হবেই। তাহলে নিষ্কামভাব রেখে কর্ম করলে কোন ফল হবে না— এটি কেমন কথা ?

উত্তর—নিষ্কামভাব রেখে করা কর্ম হলো ভাজা বীজের মতন। ভাজা বীজ চাষের কাজের অনুপযুক্ত হলেও তা খাওয়ার কাজে লাগে। সেইরূপ নিষ্কাম কর্মের যে ফল হয় তা বন্ধনকারী হয় না। সকামভাব রেখে কর্ম করলেই সেটি বন্ধনকারী হয়—**'ফলে সক্তো নিবধ্যতে'** (গীতা ৫।১২)॥২২॥

প্রশ্ন—ভক্তি মার্গে কর্ম কীভাবে দিব্যকর্ম হয় ?

উত্তর—ভগবানে তন্ময় হয়ে গেলে ভক্তের কর্ম দিব্য হয়ে যায়। ভক্তিমতি মীরার শরীরও তো দিব্য হয়ে গিয়ে ভগবানের বিগ্রহের মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছিল॥২৩॥

প্রশ্ন—গীতায় ভগবান বলেছেন, আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ অর্থাৎ কর্তব্য কর্মও কর—'*মামনুস্মর যুদ্ধ চ*' (৮।৭)। যদি ভগবানকে স্মরণ করতে থাকি তবে কর্তব্য কর্ম ঠিকভাবে করা যাবে না আর কর্তব্য কর্মে যদি মন লাগাই তাহলে ভগবানকে স্মরণ করা হবে না। দুটি একসঙ্গে কী

করে করব ?

উত্তর—প্রত্যেক কাজই মন দিয়ে করা উচিত। কিন্তু দৃষ্টি থাকা উচিত ভগবানের দিকে। প্রত্যেকটি কাজকেই ভগবানের কাজ বলে মনে করতে হবে। অলংকার তৈরি করবার সময় স্বর্ণকারের মনে 'এটি সোনা' এই ভাব দৃঢ় থাকে। এইভাবেই সমস্ত কাজ করবার সময় সাধকের মনে এই ভাব থাকা উচিত যে 'সব কিছুই হলো পরমাত্মা' ॥২৪॥

প্রশ্ন—ক্রিয়া, কর্ম, উপাসনা এবং বিবেক—এই চারটির মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

উত্তর—'ক্রিয়া' ফলদায়ক হয় না অর্থাৎ কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে না।'কর্ম' ফলদায়ক হয় অর্থাৎ তার সম্পর্ক সুখদায়ক ও দুঃখদায়ক পরিস্থিতির সঙ্গে। 'উপাসনা'-র সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে। 'বিবেক' জড়তার সঙ্গে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ ঘটায়।

কর্ম এবং উপাসনা-তে যে ক্রিয়া তাতে কল্যাণ হয় না। কর্মে নিষ্কামভাব কল্যাণ করে এবং উপাসনায় ভগবানের সঙ্গে যে সম্পর্ক তা কল্যাণ করে॥ ২৫॥

~~O~~

কলিযুগ

প্রশ্ন—ভগবান কেন কলিযুগ সৃষ্টি করেছেন ?

উত্তর—অল্প আয়াসে যাতে জীবের কল্যাণ হয় সেই উদ্দেশ্যে ভগবান কলিযুগ সৃষ্টি করেছেন। কলিকালে মানুষের সামান্য পুণ্য কাজও বড় ফল দেয়।[১] ভগবানের এই উদ্দেশ্যের সদ্ব্যবহার করতে হবে, অপব্যবহার নয় ॥২৬॥

---

[১]কলিযুগ সম যুগ আন নহিঁ জৌ নর কর বিস্বাস।
গাই রাম গুন গন বিমল ভব তর বিনহিঁ প্রয়াস॥
(রামচরিতমানস, উত্তরকান্ড, ১০৩ক)
যৎ কৃতে দশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেন তৎ।
দ্বাপরে তচ্চ মাসেন হ্যহোরাত্রেণ তৎকলৌ॥
(বিষ্ণুপুরাণ ৬।২।১৫)
'যে ফল সত্য যুগে দশ বছর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, জপ প্রভৃতি করলে পাওয়া যায়, সেই ফল মানুষ ত্রেতায় এক বছরে, দ্বাপরে এক মাসে এবং কলিযুগে একটি দিন-রাত্রে পেয়ে যায়।'

প্রশ্ন—কতদূর পর্যন্ত কলিযুগ প্রভাব ফেলতে পারে ?

উত্তর—কলিযুগের প্রভাব হলো এইটুকু যে সত্যযুগ প্রভৃতিতে ধর্মপালন সহজে করা যায় এবং কলিযুগে তা করা কঠিন। কলিযুগে ধর্মপালন কঠিন হওয়ায় অল্প অনুষ্ঠানেই অধিক ফল পাওয়া যায়॥২৭॥

প্রশ্ন—যে ক্রম অনুসারে যুগের হ্রাস হয় সেই ক্রম অনুসারে যুগের উত্থান হয় না কেন ? কলিযুগের পর দ্বাপর না এসে সোজাসুজি সত্যযুগ কেন হয় ?

উত্তর—প্রকৃতির কাজ স্বতই পতনের দিকে যায়, কিন্তু উত্থান ভগবৎ কৃপায় হয়। যেমন, মানুষ কোনো কথা নিজে থেকেই ভুলে যায়, কিন্তু সেটি মনে করতে হবে। তাই ভগবান কৃপা করে কলিযুগের পর সত্যযুগ নিয়ে আসেন॥২৮॥

প্রশ্ন—'*কলি কর এক পুনীত প্রতাপা। মানস পুন্য হোহিঁ নহিঁ পাপা ॥*' (রামচরিতমানস, উত্তরকান্ড, ১০৩।৪)—এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—ভগবান কলিযুগে এই বিশেষ সুযোগটি দিয়েছেন। মনে পুণ্য কাজ করবার ইচ্ছা হলো কিন্তু কোনো কারণে তা করতে পারা গেল না ; তাহলেও তাতে পুণ্য লাভ হবে। কোনো কারণে মনে পাপ কর্ম করবার ইচ্ছা হলো, কিন্তু করতে পারলে না, পরে সেই পাপ চিন্তার জন্য অনুতাপ হলো ; তাহলে পাপ হবে না, তাৎপর্য হলো শুধু মানসিক ভাবনায় পাপ হয় না, তা করলে পাপ হয়।

যাদের ইচ্ছা (মনোভাব) পাপ করার তাদের তো পাপ হবেই, কেননা ইচ্ছাই হলো পাপের মূল, তাতে পাপ সৃষ্টি হয়।[১] হ্যাঁ, পাপ করবার মনোভাব না থাকলেও কোনো না কোনো কারণে, পূর্ব সংস্কারবশত এবং কলিযুগের প্রভাবে মনে পাপের বাসনা যদি এসে যায় তাহলে তাতে দোষ হয় না॥২৯॥

---

[১]কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ (গীতা ৩।৩৭)

'রজোগুণ থেকে উৎপন্ন এই কাম অর্থাৎ কামনাই হলো পাপের মূল। এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। এটি অনেক দুষ্পূরণীয় এবং মহাপাপী। এই বিষয়ে তুমি একেই শত্রু বলে মনে করবে।'

প্রশ্ন—আজকাল ভণ্ড সাধুদের প্রচার বেশি কেন হয় ?

উত্তর—কলিযুগ এতে সাহায্য করে। যদি ভণ্ড সাধুদের প্রচার বেশি না হয় তাহলে কলিযুগ বলা হয় কেন ? বাস্তবে ভন্ড সাধুদের প্রচারে আড়ম্বর থাকলেও তা সাময়িক। তা স্থায়ী হয় না। প্রকৃত ত্যাগী সাধুদের প্রভাব স্থায়ী হয়। তাঁদের দ্বারা লোকেদের স্থায়ী এবং প্রকৃত কল্যাণ হয়। যার অন্তরে সামান্যতম ভোগ বাসনা থাকে তার দ্বারা লোকের প্রকৃত কল্যাণ হয় না॥৩০॥

প্রশ্ন—কলিযুগের নিবাস স্বর্ণের মধ্যে বলা হয়েছে। তাহলে মেয়েদের সোনার অলঙ্কার পরা উচিত, না উচিত নয় ?

উত্তর—অলঙ্কার পরায় কোনো দোষ নেই। স্বর্ণকে পবিত্র বস্তু মনে করা হয়ে থাকে। স্বর্ণের অহঙ্কারের মধ্যে কলিযুগের নিবাস॥৩১॥

~~o~~

কামনা

প্রশ্ন—সুখভোগের ইচ্ছা কেন হয় ?

উত্তর—শরীরের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নিলে অর্থাৎ শরীরকে আমি, আমার এবং আমার জন্য বলে মেনে নিলে সুখভোগের ইচ্ছা হয়॥৩২॥

প্রশ্ন—আমাতে কামনা এবং মমতা আছে কিনা—কী করে বোঝা যাবে ?

উত্তর—যদি হৃদয়ে কখনও অশান্তি বা চাঞ্চল্য হয় তাহলে বুঝতে হবে যে অন্তরে কামনা আছে। আপন পর ভেদ মমতার কারণে হয়। যার প্রতি মমতা আছে তার প্রভাব নিজের উপর পড়ে॥৩৩॥

প্রশ্ন—সুখের কামনা এবং আশার মধ্যে প্রভেদ কোথায় ?

উত্তর—সুখ পাওয়ার এবং দুঃখ না পাওয়ার 'কামনা' হয়। আর সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা হলে 'আশা' হয়॥৩৪॥

প্রশ্ন—আমাদের দুঃখ দূর হোক— এমন কামনা করা উচিত, না করা উচিত নয় ?

উত্তর—কোনো রকম কামনাই করা উচিত নয়। দুঃখ দূর হোক এমন কামনা করলে সুখভোগ হবে। বন্ধন ছিন্ন হোক এই কামনা করলে মুক্তির ভোগ

হবে। নিজের জন্য জড়তার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদও যেন না থাকে। তাহলে সূক্ষ্ম অহং থেকে যাবে। তাৎপর্য হলো এই যে, আমাদের কোনো কিছুই নেওয়ার নেই।

সাধক ভগবানের উপর যত বেশি নির্ভরশীল হবেন ততই তিনি এগিয়ে যান। নিজের জন্য যদি তাঁর কোনো প্রত্যাশা না থাকে, সব ভগবানের উপর ছেড়ে দেন, তাহলে খুবই বৈশিষ্ট্য এসে যায় এবং তত্ত্বের প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং সর্বোত্তম কথা হলো নিজের মুক্তির জন্যও ইচ্ছা থাকবে না। যেমন ভক্ত নরসী যখন ভগবান শঙ্করের দর্শন পেয়েছিলেন তখন তিনি কিছুই চাননি। বরং এইটিই বলেছিলেন যে, আপনার যা ভাল লাগে তাই দিন। মানুষ তার নিজস্ব বুদ্ধি অনুসারেই যা করে থাকে। কিন্তু তার পরেও তত্ত্ব অনন্ত, বিচিত্র ঐশ্বর্য থেকে যায়। সাধকের নিজের জন্য যদি কোনো আগ্রহ না থাকে এবং তুষ্টির ভাব না আনেন ; তাহলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে যেতে থাকবেন ॥৩৫॥

প্রশ্ন—ভগবান হলেন কল্পবৃক্ষ আর সব মানুষ তাঁরই ছায়াতে থাকে। তাহলেও মানুষের সকল ইচ্ছা কেন পূর্ণ হয় না ?

উত্তর—কল্পবৃক্ষের কাছে যা চাইবে তাই পাওয়া যাবে। তাতে আমাদের ভাল নাও হতে পারে। কিন্তু ভগবান আমাদের তাই দেন যাতে আমাদের কল্যাণ হয়। লোকে সেইটিই ইচ্ছা করে যা থেকে পরিণামে দুঃখ পেতে হয়। এজন্য ভগবান তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন না, এইটুকু দুঃখই যথেষ্ট। আর দুঃখ কেন চাইছ ! কল্পবৃক্ষ এবং দেবতা দোকানদারদের মতো। কিন্তু ভগবান বাবার মতো॥৩৬॥

প্রশ্ন—কিন্তু ভগবান সৎ জিনিসের ইচ্ছাও তো পূর্ণ করেন না। সাধক তো ভগবানকে চান তাহলে তাঁকে সকলেই কি পেয়ে থাকেন ?

উত্তর—সৎ জিনিসের ইচ্ছা এইজন্যই পূর্ণ হয় না যে তার সঙ্গে অ-সৎ ইচ্ছাও থাকে॥৩৭॥

প্রশ্ন—একটি বইতে লেখা আছে যে মানুষ যা কিছু কামনা করুক তা পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। কথাটি কি ঠিক ?

উত্তর—এমন হওয়া অসম্ভব। কামনা অনন্ত। সেজন্য সকল কামনা কখনই

পূরণ হবে না, আর মুক্তিও হবে না। যে কামনাকে নিয়ে জপতপ করা হয় সেই কামনারই পূর্তি হয়। যেমন, ধ্রুব রাজ্য প্রাপ্তির কামনা নিয়ে তপস্যা করেন । সেই কামনা পরবর্তীকালে না থাকলেও ভগবান তা পূর্ণ করেছিলেন। সেই রকম ভগবানের কাছে যাওয়ার সময় বিভীষণের মনে রাজ্যের কামনা ছিল। ভগবান তা পূর্ণ করেছিলেন। তাৎপর্য হলো ভগবানে যুক্ত হওয়ার সময় যে কামনা থাকে সেই কামনা হলো প্রতিবন্ধক। ভগবান সেই কামনা পূর্ণ করেন॥৩৮॥

প্রশ্ন—কোনো কামনা রেখে যে ভগবানের ভজনা করে তাঁর কি ভগবৎপ্রাপ্তি হতে পারে ?

উত্তর—ভগবৎপ্রাপ্তি তো দূরের কথা, তার মঙ্গলও হয় না॥৩৯॥

প্রশ্ন—কিন্তু ভগবান তো ধন কামনাকারী ভক্তকেও উদার বলেছেন—'*উদারাঃ সর্ব এবৈতে*'। (গীতা ৭।১৮)

উত্তর—অর্থার্থী ভক্তের হৃদয়ে ভগবান হলেন মুখ্য, ধন গৌণ। এজন্য ভগবান বলেছেন—***'চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্'*** (গীতা ৭।১৬)। সে ভগবান ছাড়া আর কারও কাছে ধন চায় না। কিন্তু যে ভক্ত নয় সে কেবল কামনা পূরণের জন্য ভগবানের ভজনা করে। তার কল্যাণ হতে পারে না। কারণ সে ভগবানকে ভগবান (সাধ্য) বলে মানেনি। কামনা পূরণের জন্য কেবল সাধন ভজন মেনে নিয়েছে। তার সাধ্য হলো টাকা এবং ভগবান নোট ছাপাবার যন্ত্রের মতো এক সাধন। এই রকম মানুষের কামনা পূর্ণ না হলে তারা ভগবানকে ত্যাগ করে। একজন নারীর স্বামী অসুস্থ হয়েছিল। কেউ তাকে পরামর্শ দিল যে ঠাকুরের পূজা কর তাহলে স্বামী ভাল হয়ে যাবে। সে তাই করল। স্বামী ভাল হয়ে গেল। আবার যখন স্বামী অসুস্থ হলো তখন তার স্ত্রী আবার ঠাকুরের পূজা করল। স্বামী মারা গেল। মেয়েটি ঠাকুরকে তুলে বাইরে ফেলে দিল। এইভাবে যে ভগবানের পূজা করে তার কল্যাণ হয় না॥৪০॥

প্রশ্ন—ভগবান তো আমাদের এবং আমাদের জন্য। তাহলে তাঁর কাছে কিছু চাওয়া দোষের কেন ?

উত্তর—প্রভু আমার এবং আমার জন্য—একথা বলার তাৎপর্য এটি নয়

যে প্রভুর কাছ থেকে আমাদের কিছু নিতে হবে। তিনি আমার জন্য। সেজন্য নিজেকে তাঁর কাছে সঁপে দিতে হবে। তাঁর কাছে সমর্পিত হতে হবে। কিছু চাইলে আমরা তাঁর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাব। আর নিজেকে দিলে তার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাব। তাঁর কাছ থেকে যে বস্তুটি চাইব তাই প্রাধান্য পাবে। যে বস্তু নিজের এবং নিজের জন্য নয় তা কামনা করার অধিকার আমাদের নেই॥৪১॥

~~○~~

গীতা

প্রশ্ন—ভগবান গীতার কথাগুলি যুদ্ধের সময় বলেছিলেন কেন ?

উত্তর—এই কথা বলার জন্য যে যুদ্ধের মতো গুরুতর কাজ করতে করতেও মানুষ কল্যাণ লাভ করতে পারে! তাৎপর্য হলো, সাধনা কোনো পরিস্থিতিরই অপেক্ষা করে না। সকল পরিস্থিতি, সকল অবস্থাতেই তা করা যায়। কেননা পরমাত্মা সকল অবস্থাতেই একভাবে বিদ্যমান থাকেন। অতএব তাঁকে সকল পরিস্থিতিতেই পাওয়া যেতে পারে॥৪২॥

প্রশ্ন—গীতার সিদ্ধান্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ কেন মানা হয়েছে ?

উত্তর—তার কারণ এই সিদ্ধান্ত হলো ভগবানের, ঋষি মুনিদের নয়। ভগবান ঋষি-মুনিদেরও আদি—*অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষিণাং চ সর্বশঃ* (গীতা ১০।২)। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সিদ্ধান্তই 'সিদ্ধান্ত' বলার যোগ্য। অন্য দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত বাস্তবে 'সিদ্ধান্ত' নয়, সেগুলি হলো 'মত'॥৪৩॥

প্রশ্ন—ভগবান রামায়ণে বলেছেন, '*মম দরসন ফল পরম অনূপা। জীব পাব নিজ নিজ সহজ সরূপা॥*' (অরণ্যকান্ড ৩৬।৫) অর্জুন তো ভগবানের বিশ্বরূপ, চর্তুভুজরূপ এবং দ্বিভুজরূপ— তিনটিরই দর্শন করেছিলেন। তাহলেও তাঁর মোহ দূর কেন হয়নি ?

উত্তর—দর্শন দেওয়ার পর মোহ দূর করবার দায় ভগবানেরই থাকে। অর্জুনের মোহ তো পরে দূর হয়ে গিয়েছিল **'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা।'** (গীতা ১৮।৭৩)। তাতে প্রমাণ হয় যে দর্শন লাভের পর মোহ দূর হবেই। কিন্তু অর্জুন মোহ দূর হওয়ার জন্য শ্রবণ এবং দর্শনকে কারণ বলে মনে করেননি।

ভগবানের কৃপাকেই তিনি কারণ বলে মনে করেছেন—'ত্বৎ-প্রসাদান্ময়াচ্যুত' ॥৪৪॥

প্রশ্ন—গীতাতে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের আচরণকেই প্রধান বলে মানা হয়েছে—'*যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ*' (৩।২১) আর ভাগবতে উপদেশকে প্রধান বলা হয়েছে—'*ঈশ্বরাণাং ব সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ*' (১০।৩৩।৩২)। দুটির কোন্ কথাটি মানা হবে ?

উত্তর—সংসারের প্রতি লোকেদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দৃষ্টিতেই গীতায় বলা হয়েছে যে শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা যেমন আচরণ করেন অন্য লোকেরাও সেই রকম করেন। তবে বাস্তবে কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে উপদেশকে আদর্শরূপে মানাই ভাল। এজন্য ইতিহাস অপেক্ষা বিধিকে এবং বিধি অপেক্ষা নিষেধকে বড় বলে মানা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ মানুষদের আচরণের প্রভাব সাধারণের উপর পড়ে, তা আমরা দেখতে পাই, বা না পাই। কিন্তু যেখানে বিভিন্নমুখী আচরণ এবং উপদেশগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা যায় সেখানে তাঁদের আচরণ না দেখে উপদেশগুলিকেই অনুসরণ করতে হবে। তার কারণ তাঁরা কোন্ পরিস্থিতিতে কী করেছেন তা বোঝা যায় না॥৪৫॥

প্রশ্ন—অ-সৎ-এর কোনো সত্তা নেই-'*নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ*' (গীতা ২।১৬), তাহলে প্রকৃতিকে অনাদি কেন বলা হয়েছে- '*প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি*' (গীতা ১৩।১৯) অনাদি বললে এই ভাব প্রকাশ পায় যে প্রকৃতির সত্তা আছে।

উত্তর—অজ্ঞানীকে বোঝাবার জন্য অজ্ঞানীর ভাষাই বলতে হয়। আমরা প্রকৃতির সত্তাকে মানি। তাই শাস্ত্র আমাদের ভাষাতেই কথা বলে। বাস্তবে প্রকৃতির সত্তাই নেই। কিন্তু যাদের দৃষ্টিতে প্রকৃতির সত্তা আছে তাদের জন্য প্রকৃতিকে অনাদি বলা হয়। প্রকৃতি অনাদি হলেও অনন্ত নয়। বরং তা হলো সান্ত (অন্তবিশিষ্ট)।

দৃষ্টি ভেদে দর্শন অনেক, তত্ত্ব একটি। যেখানে দ্রষ্টা, দৃষ্টি এবং দৃশ্য নেই, সেখানে ভেদাভেদ নেই। দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, দার্শনিক যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ভেদও থাকে। অন্তিম তত্ত্বে কোনো ভেদ নেই॥৪৬॥

প্রশ্ন—গীতা প্রকৃতিকে অনাদি বলেছে, অনন্ত বা সান্ত বলেনি, এমন কেন ?

উত্তর—যদি প্রকৃতিকে অনন্ত (নিত্য) বলা হয় তাহলে জ্ঞানকে খণ্ডন করা হয়। কেননা জ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রকৃতির সত্তা নেই — **'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** (গীতা ২।১৬)। যদি প্রকৃতিকে সান্ত (অনিত্য) বলা হয় তাহলে ভক্তিকে খন্ডন করা হয়। কেননা ভক্তির দৃষ্টিতে প্রকৃতি ভগবানের শক্তি হওয়ায় ভগবানের থেকে অভিন্ন—**'সদসচ্চাহম্'** (গীতা ৯।১৯)। অতএব ভগবান জ্ঞান এবং ভক্তি— দুটিরই কথা রাখার জন্য প্রকৃতিকে অনন্তও বলেননি এবং সান্তও বলেননি বরং বলেছেন অনাদি॥৪৭॥

প্রশ্ন—ভগবান গীতায় বলেছেন, আমি যদি কর্তব্য পালন না করি তাহলে লোকেরাও কর্তব্যবিমুখ হয়ে যাবে, তাই আমিও কর্তব্য পালন করি (৩।২২-২৪)। তাহলে আজকাল লোকেরা তাদের কর্তব্য পালন কেন করে না ?

উত্তর—ভগবানের কথা তাদের জন্য যারা ভগবানকে মানে (আস্তিক)। ভগবানের কর্তব্য পালনের প্রভাব তাদের উপর পড়বে যাদের ভগবানের উপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস আছে। যারা ভগবানকে মানে না তাদের উপর ভগবানের কর্তব্য পালনের প্রভাব পড়বে না। যাদের বিপরীত-বুদ্ধি তারা ভগবানের কৃপার কী বুঝবে ?॥৪৮॥

প্রশ্ন—গীতাতে ভগবান বলেছেন-'*সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভযমেব চ*' (১০।৪)। 'অভয়' দৈবী সম্পদ আর 'ভয়' আসুরী সম্পদ। তাহলে দুটিই ভগবানের স্বরূপ কেমন করে হলো ?

উত্তর—দৈবী সম্পদ ভগবানের স্বরূপ এবং আসুরী সম্পদও ভগবানের স্বরূপ। অভয়ও ভগবানের স্বরূপ এবং ভয়ও ভগবানের স্বরূপ। বাস্তবে তত্ত্ব একটিই কিন্তু আমাদের কামনার (ভোগেচ্ছা) ফলে দুটি বিভাগ হয়ে যায়।

ভগবানের বিরাট রূপে ভয়ভীতও দৃষ্ট হন—**'রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি'** (গীতা ১১-৩৬), **'কেচিৎভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি'** (গীতা ১১।২১)। ভয়ভীত তো বিরাট রূপেরই অঙ্গ। তাৎপর্য হলো যে ভয়ভীত হয় সেও ভগবান এবং যার জন্য ভয়ভীত হচ্ছে সেও ভগবান।

মানুষ সুখ চায়, দুঃখ চায় না। তাতেই দুটি বিভাগ হয়ে গেল। আর শাস্ত্রগুলিও দুটি বিভাগের (দৈবী-অসুরী, শুভ-অশুভ, বিহিত-নিষিদ্ধ প্রভৃতির) বর্ণনা করেছে। এই বিভেদের মূলে আছে ভোগেচ্ছা। দুঃখ, সন্তাপ, অনিষ্ট প্রভৃতি হলো ভোগেচ্ছার ফল। ভোগেচ্ছা সম্পূর্ণভাবে দূর হলেই মোক্ষ প্রাপ্তি ॥৪৯॥

প্রশ্ন—ভগবানে মন নিয়োজিত করা করণ-সাপেক্ষ সাধনা, এতে যোগভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবু গীতায় ভক্তের মন নিয়োজিত করার কথা কেন বলা হয়েছে — '*মন্মনা ভব*' (৯।৩৪, ১৮।৬৫)?

উত্তর—বাস্তবে ভক্ত স্বয়ং নিমগ্ন হয়, মন নয়। মন নিয়োজিত করে নিজে নিমগ্ন হওয়া করণ-সাপেক্ষ। কিন্তু স্বয়ং নিমগ্ন হয়ে যাওয়ায় মনের নিজে থেকেই নিয়োজিত হওয়া করণ-নিরপেক্ষ। ভক্ত মনকে নিয়োজিত করে নিজে নিমগ্ন হয় না—সে স্বয়ং নিয়োজিত, নিমগ্ন হয় (**মদ্ভক্তঃ**), তখন মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিজে থেকেই নিয়োজিত হয় ॥৫০॥

প্রশ্ন—গীতা জগৎকে অ-সৎ বলেছে কিন্তু রজ্জুতে সর্প দর্শনের মতো অধ্যস্ত বলেনি। এর কারণ কী ?

উত্তর—রজ্জুতে সর্প দর্শন বোধ জাগ্রত হওয়ার পর হয় না। কিন্তু বোধ হওয়ার পরও সংসার দৃষ্টিগোচর হয়। আসক্তি (দোষ) কর্তাতে থাকে, কিন্তু পরিলক্ষিত হয় জগতে। নিজের অনুরাগবশত ধনের প্রতি আকর্ষণ (লোভ) হয়। অনুরাগ না থাকলে টাকা-পয়সা টাকা-পয়সারূপে দৃষ্ট হলেও সেগুলিতে আকর্ষণ থাকে না। এই রকম, ভোগে আসক্তি না থাকলে জগৎ জগৎরূপে পরিলক্ষিত হলেও তার প্রতি আকর্ষণ থাকে না।

বাস্তবে জগৎ অধ্যস্ত নয় তার সঙ্গে সম্বন্ধই হলো অধ্যস্ত। আসক্ত ব্যক্তির কাছেও জগৎ দৃষ্ট হয় এবং অনাসক্তের কাছেও জগৎ দৃষ্ট হয়। কিন্তু আসক্ত দেখে ভরাট আর অনাসক্ত দেখে ফাঁপা। যা আসলে নেই কিন্তু আছে বলে দেখায় তাকেই অধ্যস্ত বলে। কিন্তু জগৎ যেমনকার তেমনই দেখায়, তার সঙ্গে সম্বন্ধ (অনুরাগ) থাকে না। জ্ঞানী মহাপুরুষেরা মোহরকে মোহর রূপে দেখেন, পাথররূপে দেখেন না। কিন্তু মোহরের প্রতি তাঁদের অনুরাগ থাকে

না। তাৎপর্য হলো, জগতের সত্তা বাধক নয়, অনুরাগের সঙ্গে যুক্ত সম্বন্ধই হলো বাধক। বৈরাগ্য বস্তুর অস্তিত্বকে বিনষ্ট করে না, বরং সেগুলির প্রতি যে অনুরাগ তা নাশ করে। অনুরাগপূর্ণ সম্বন্ধই বন্ধন সৃষ্টিকারী। জগৎ দুঃখদায়ক নয়, তার সঙ্গে যে সম্বন্ধ সেইটিই দুঃখদায়ক॥৫১॥

প্রশ্ন—রজ্জুতে সর্প দর্শন হলো 'নিরুপাধিক ভ্রম' এবং দর্পণে মুখ দেখা হলো 'সোপাধিক ভ্রম'।[১] জগৎকে কি 'সোপাধিক ভ্রম' বলা যায়, কেননা ভ্রম দূর হওয়ার পরও দর্পণে মুখ দেখা যায়।

উত্তর—সোপাধিক ভ্রম বলা যায় না, কেননা দর্পণে মুখ দেখা গেলেও তা কোনো কাজে আসে না অর্থাৎ তার দ্বারা কোনো কাজ হয় না। কিন্তু জগতের প্রতি অনুরাগ দূর হলেও তাকে দিয়ে কাজ হয়॥৫২॥

প্রশ্ন—গীতাতে আছে যে যোগভ্রষ্ট পুরুষ শুদ্ধ শ্রীমানের ঘরে জন্ম নেন অথবা যোগীদের কুলে জন্ম নেন (গীতা ৬।৪১-৪২)। কিন্তু জড়-ভরত হরিণ যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাহলে তিনি কেমন যোগভ্রষ্ট ছিলেন?

উত্তর—তাঁকে যোগভ্রষ্ট বলা যায় না। তার কারণ যোগভ্রষ্ট পুরুষ সাধনা পূর্ণ করবার জন্য শুদ্ধ শ্রীমানদের গৃহে অথবা যোগীদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে পূর্বকৃত সাধনায় আবার নিযুক্ত হন। কিন্তু জড় ভরত শ্রীমানদের গৃহেও জন্মগ্রহণ করেননি, যোগীদের কুলেও জন্ম নেননি, তিনি হরিণ যোনিতে জন্মেছিলেন। তিনি হরিণ যোনিতে কোনো সাধনাও করেননি। তাই তিনি যোগভ্রষ্ট ছিলেন না। জীবনের অন্তিম সময়ে তাঁর মন হরিণের দিকে যাওয়াতেই তাঁকে আবার জন্ম নিতে হয়েছিল॥৫৩॥

প্রশ্ন—ভগবান গীতায় কর্মযোগ (সাধনা)কে অব্যয় বলেছেন— ইমং *বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্* (৪।১)। অব্যয় অর্থাৎ যা নিত্য সেটিই তো সাধ্য। সাধনা নিত্য কেমন করে?

উত্তর—সাধকই সাধনা হয়ে সাধ্যে লীন হয়ে যান। অতএব সাধক, সাধনা এবং সাধ্য—তিনটিই তত্ত্বত এক। কিন্তু মোহের কারণে তাদের ভিন্ন ভিন্ন

[১]নিরুপাধিক— উপাধিমুক্ত। সোপাধিক— উপাধিযুক্ত।

দেখায়। তিনটিই নিত্য, কিন্তু মোহবশত মনে হয় অনিত্য— **'নষ্টো মোহঃ'** (গীতা১৮।৭৩) ॥৫৪॥

প্রশ্ন—ভগবান গীতায় স্বয়ং-কে 'শরীরী' (শরীরবিশিষ্ট) এবং 'দেহী' (দেহবিশিষ্ট) বলেছেন। তাতে কি এইটিই প্রমাণিত হলো যে স্বয়ং-এর সম্বন্ধ শরীরের সঙ্গে আছে ?

উত্তর —শরীরের সঙ্গে স্বয়ং এর কখনও বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না, কখনো হবে না, এবং এখনও নেই। কিন্তু ভগবান সাধকদের বোঝাবার দৃষ্টিতে স্বয়ংকে 'শরীরী' অথবা 'দেহী' নামে উল্লেখ করেছেন। 'শরীরী' বলার তাৎপর্য হলো এই যে, তুমি শরীর নও। স্বয়ং পরমাত্মার অংশ— **'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭) এবং শরীর প্রকৃতির অংশ— **'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি'** (গীতা ১৫।৭)। শরীর প্রতিক্ষণ বিনষ্ট হয় এবং তা অ-সৎ। এমন অ-সৎ শরীরকে নিয়ে স্বয়ং কী করে শরীরী (শরীরবিশিষ্ট) হতে পারে ? সুতরাং সাধক স্বয়ং শরীর নয়, শরীরীও নয়॥৫৫॥

~~○~~

নিশ্চুপ-সাধনা

প্রশ্ন—নিশ্চুপ-সাধনা সহজে কী করে হতে পারে?

উত্তর—আমাকে বসতে হবে, নিশ্চুপ-সাধনা করতে হবে— এমন সঙ্কল্প থাকলে নিশ্চুপ-সাধনা ভালো হয় না। কেননা বৃত্তিতে গর্ভ অর্থাৎ'বীজ' থাকে। আমাকে কিছু করতে হবে না—এটিও 'করা'। নিশ্চুপ-সাধনা তখনই ভাল হয় যখন কিছু করার কামনা থাকে না। যা দেখার ছিল তা দেখা হয়ে গিয়েছে, শোনার যা ছিল শোনা হয়ে গিয়েছে, বলার ছিল যা বলা হয়ে হয়েছে। এই রকম কোনো কিছু দেখার, শোনার, বলার প্রভৃতি ইচ্ছা যেন না থাকে। কামনা থাকলে নিশ্চুপ সাধনা ভাল হয় না॥৫৬॥

প্রশ্ন—কিছু করার না থাকলে সিদ্ধি হয়ে যায়, তাহলে সাধনা হবে কী করে?

উত্তর—সিদ্ধি হয়ে গেলে কামনা থাকে না, এমন কথাই শুধু নয়,

অ-সতের সত্তাই উঠে যায়। না করার কামনা থাকে, না না-করার কামনা থাকে— **'নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন'** (গীতা ৩।১৮)। অতএব রুচি না থাকলেই সিদ্ধি হয় না, বরং অ-সতের সত্তা না থাকলেই সিদ্ধি হয়। সম্পূর্ণরূপে রুচি দূর না হলেও নিশ্চুপ-সাধনা হতে পারে॥৫৭॥

প্রশ্ন—নিশ্চুপ সাধনায় বাধা কী?

উত্তর—বস্তু এবং ক্রিয়ার প্রতি আকর্ষণ অর্থাৎ বস্তুর প্রতি আসক্তি এবং করার তাড়া নিশ্চুপ-সাধনার বাধা॥৫৮॥

প্রশ্ন—নিশ্চুপ সাধনা এবং সমাধির মধ্যে প্রভেদ কী?

উত্তর—নিশ্চুপ সাধনা সমাধি অপেক্ষাও উচ্চ। কেননা এতে সমাধির অপেক্ষা দ্রুত তত্ত্ব লাভ হয়। নিশ্চুপ সাধনা স্বতঃপ্রণোদিত, কৃতিসাধ্য নয়। কিন্তু সমাধি কৃতিসাধ্য। নিশ্চুপ হয়ে গেলে সব একাকার হয়ে যায়, কিন্তু সমাধিতে তা হয় না। সমাধিতে সময় পেয়ে নিজে থেকেই উত্থান হয়। কিন্তু নিশ্চুপ সাধনায় ব্যুত্থান হয় না। নিশ্চুপ সাধনায় বৃত্তির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয় কিন্তু সমাধিতে বৃত্তির সহায়তা হয়॥৫৯॥

প্রশ্ন—নিশ্চুপ-সাধনায় চিন্তনকে কে উপেক্ষা করে?

উত্তর—উপেক্ষা স্বয়ং-ই করে, যে কর্তা অর্থাৎ যার মধ্যে কর্তৃত্ব আছে। সিদ্ধ হয়ে গেলে তা স্বভাব হয়ে যায়, তার কর্তৃত্ব থাকে না॥৬০॥

প্রশ্ন—উপেক্ষা অথবা সাক্ষীর ভাব তো বুদ্ধিতেই থাকবে?

উত্তর—ভাব তো বুদ্ধিতে থাকবে কিন্তু তার পরিণাম স্বয়ং (স্বরূপ)-এ হবে। যেমন, যুদ্ধ তো সেনারা করে, কিন্তু জয় রাজার হয়। উপেক্ষার দ্বারা, ঔদাসীন্যের দ্বারা, জড়তার সঙ্গে স্বয়ং-এর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায়॥৬১॥

প্রশ্ন—জাগ্রত-সুষুপ্তির লক্ষণ কী?

উত্তর—যখন স্থূল শরীরের 'ক্রিয়া' থাকে না, সূক্ষ্ম-শরীরের চিন্তন থাকে না এবং কারণ-শরীরের 'নিদ্রা' তথা 'চৈতন্যহীনতা' থাকে না তখন হলো জাগ্রত-সুষুপ্তি অবস্থা। জাগ্রত-সুষুপ্তি এবং নিশ্চুপ-সাধনা একই।

সমাধিতে তো লয়, বিক্ষেপ, কষায় এবং রসাস্বাদ— এই চারটি দোষ (বিঘ্ন) থাকে। কিন্তু জাগ্রত-সুষুপ্তিতে এই দোষগুলি থাকে না। পরমাত্মা ধ্যেয়

হওয়ায় সাধকের বৃত্তি পরমাত্মায় নিয়োজিত থাকে, তখন জাগ্রত-সুষুপ্তি হয়। এতে সুষুপ্তির মতো বাহ্যজ্ঞান থাকে না। কিন্তু ভিতরে জ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ (স্বরূপের জাগৃতি) থাকে॥৬২॥

~~○~~

জীবন্মুক্ত (তত্ত্বজ্ঞ)

প্রশ্ন—জ্ঞানী মহাপুরুষদের দ্বারা যে ক্রিয়াগুলি হয়ে থাকে সেগুলির কেউ কর্তা থাকে না। তাহলে (অহম্ ছাড়া) ঐ সব ক্রিয়া হয় কী করে ?

উত্তর—জীবনমুক্ত পুরুষের ক্রিয়াগুলি অভিমানশূন্য অহম্-এর দ্বারা হয়। একে 'অহংবৃত্তি'ও (বৃত্তিরূপ সমষ্টি অহঙ্কার) বলা হয়। যখন তার লৌকিক শরীর থাকে না তখন এই অভিমানশূন্য অহম্ পরমাত্ম-তত্ত্বে বিলীন হয়ে যায়।

যতক্ষণ পর্যন্ত ভাগ্যের জোর থাকে ততক্ষণ জীবন্মুক্তের দ্বারা নিজের এবং অন্যের ভাগ্যানুসারে ক্রিয়া হয়। তবে সেই ক্রিয়া বিনা কর্তাতেই হয়ে থাকে, যেমন, রেলগাড়ী চলেছে এবং ড্রাইভার তা থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়ল। তাহলেও ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি চলতেই থাকবে। অথবা কেউ ঠেলাকে ধাক্কা দিয়ে তারপর নিজেই তাতে উঠে পড়ল। তাহলেও চালক ছাড়াই ঠেলা (যতক্ষণ বেগ আছে) চলতে থাকে।

মুক্ত পুরুষের পূর্বে (সাধনাবস্থায়) যেমন স্বভাব, সঙ্গ, শিক্ষা, সাধনা প্রভৃতি ছিল সেই অনুসারেই তার সকল ক্রিয়া হতে থাকে। অহংভাব না থাকায় সেই সব ক্রিয়া ফলদায়ক হয় না।

অন্য ব্যক্তির সম্ভাবনা অনুসারে জীবন্মুক্ত পুরুষের দ্বারা বিশেষ ক্রিয়া হতে পারে, তার উদ্ধারের ভাব উৎপন্ন হতে পারে। অতএব তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করে মানুষ বিশেষ লাভ পেতে পারে॥৬৩॥

প্রশ্ন—আচরণে জ্ঞানী মহাপুরুষদের কী ভুল হতে পারে ?

উত্তর—হ্যাঁ, হতে পারে। সেজন্যই উপনিষদের দীক্ষান্তের উপদেশে আছে—

যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।

(তৈত্তেরীয়োপনিষদ্ ১।১১)

'আমার যত সব ভালো আচরণ হয় তোমার উচিত সেগুলিরই সেবন করা, অন্যগুলির নয়।'

যদি আচরণে ভুল না হোত তাহলে তিনি এমন কথা কেন বলতেন ? দ্বিতীয় কথা, তাঁদের সকল আচরণকে আমরা বুঝতে পারি না অর্থাৎ তিনি কখন কী করেছেন এবং কেন করেছেন। অন্তরে যদি শ্রদ্ধা থাকে তাহলে তাঁদের ভুল থেকেও লাভ হয়, ক্ষতি হয় না। তার কারণ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি নিজের বোধের স্বল্পতা স্বীকার করেন যে এঁরাই ঠিক করেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি। নিজের সীমাবদ্ধতা না মেনে নিলে, নিজের বুদ্ধিমত্তার অহঙ্কার থাকলেই মানুষেরা তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষকে দোষারোপ করে—**নিজ অগ্যান রাম পর ধরহী।** (রামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৭৩।৫)॥৬৪॥

প্রশ্ন—জ্ঞানী পুরুষদের দ্বারা কি নিষিদ্ধ কর্মও হতে পারে ?

উত্তর—নিষিদ্ধ কর্ম কামনা থেকে হয়।[১] জ্ঞান হয়ে গেলে কামনা সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হয়ে যায়—**'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে'** (গীতা ২।৫৯), 'কামক্রোধবিযুক্তানাম্' (গীতা ৫।২৬)। অতএব জ্ঞানীর দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম হওয়া অসম্ভব। কিন্তু মনের মতো না হলে লোকেরা জ্ঞানীর কোনো কোনো কাজকে নিষিদ্ধ বলে মনে করতে পারে। তার কারণ অন্যের কোনো কাজ আমাদের মনের প্রতিকূল হলে তা আমাদের কাছে খারাপ মনে হতে পারে, যদি সেই কাজ ভালো হয় তাহলেও।[২] অন্যেরা কোনো কাজ কী ভাবনা নিয়ে করেছে, কোন্ পরিস্থিতিতে করেছে তা নির্ণয় করা কঠিন।

---

[১]কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপমা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ (গীতা ৩।৩৭)

[২]দ্বেষো ন সাধুর্ভবতি ন মেধাবী ন পণ্ডিতঃ।
প্রিয়ে শুভানি কার্যাণি দ্বেষ্যে পাপানি নৈব হ॥
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৩৯।৪)

'যার মধ্যে দ্বেষ থাকে তাকে সাধু, বিদ্বান বা বুদ্ধিমান বলে মনে হয় না। যে প্রিয় তার সব কাজ ভাল মনে হয় আর যাকে দ্বেষ করি তার সকল কাজই খারাপ লাগে।'

ভগবান এবং মহাত্মাগণের দ্বারা কারও কোনো অহিত হয় না—

হেতু রহিত জগ যুগ উপকারী। তুম তুম্হার সেবক অনুসারী॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকান্ড ৪৭।৩)

নারদ নলকূবর এবং মণিগ্রীবকে বৃক্ষ হয়ে যাওয়ার যে অভিশাপ দিয়েছিলেন সেই অভিশাপও ভগবানকে লাভ করার পাথেয় হয়ে গিয়েছিল[১] ॥৬৫॥

প্রশ্ন—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের উপর কি লোকসংগ্রহের দায় থাকে ?

উত্তর—জীবন্মুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের উপর লোকসংগ্রহের অথবা প্রাণিমাত্রের হিতসাধন করবার কোনো দায় থাকে না। তাঁদের নিজেদের তো বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও থাকে না— **'নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন'** (গীতা ৩।১৮)। তাঁদের উপরে কারও কোনো ঋণ থাকে না। তাঁদের কোনো কিছু করার, জানার এবং পাওয়ার অবশেষ থাকে না। কিন্তু সাধনাবস্থায় প্রাণিমাত্রের হিতাকাঙ্ক্ষা থাকায় সিদ্ধাবস্থাতেও তাঁদের সেই স্বভাব থেকে যায় —**'স্বভাবস্তু প্রবর্ততে'** (গীতা ৫।১৪)। অতএব তাঁরা লোকসংগ্রহ না করলেও স্বাভাবিকভাবে তাঁদের দ্বারা লোকসংগ্রহ হয়ে যায়॥৬৬॥

প্রশ্ন—জীবন্মুক্ত পুরুষ শারীরিক ব্যাধির অনুভব করেন, না করেন না ?

উত্তর—ব্যাধির জ্ঞান তো হয়, কিন্তু দুঃখ হয় না॥৬৭॥

প্রশ্ন—তাঁর যখন শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না তখন তাঁর শরীরের ব্যাধির জ্ঞান কেন হয় ?

উত্তর—জীবন্মুক্ত হয়ে গেলে সেই 'চেতন তত্ত্ব' সর্বব্যাপী হয়। প্রাণ

---

[১]সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্ বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১০।৪১)

'যাঁদের বুদ্ধি সমদর্শী এবং হৃদয় সম্পূর্ণরূপে আমার প্রতি সমর্পিত সেই সাধু পুরুষদের দর্শনে বন্ধন হওয়া সেই রকমই অসম্ভব যেমন সূর্যোদয় হয়ে গেলে মানুষের চোখের সামনে অন্ধকারের অবস্থান।'

সর্বব্যাপী হয় না। তিনি শরীর-নিরপেক্ষ হয়ে যান, শরীর-রহিত হন না। শরীরের সঙ্গে তাঁর সজ্ঞান সম্পর্ক হয়, অজ্ঞতা পূর্ণ সম্বন্ধ হয় না, যা সাধনাবস্থায় তাঁর শরীরের সঙ্গে ছিল। এজন্য শরীরের ব্যাধির জ্ঞান তাঁর হয়, কিন্তু তার কোনো প্রভাব পড়ে না, অর্থাৎ তাঁর দুঃখরূপ বিকার হয় না। যেমন, শৈশবে কাচের টুকরোরও আকর্ষণ থাকে, তাকে খুব ভাল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন কাচের টুকরোর জ্ঞান তো আছে, কিন্তু তার কোনো প্রভাব থাকে না।

ব্যাধির জ্ঞান না থাকাই জীবনমুক্তির প্রমাণ নয়। জীবন্মুক্ত অর্থাৎ জীবন (শরীর) থাকলেও মুক্ত হয়ে গিয়েছে—এমন কথা বলার অর্থ হলো শরীরের ব্যাধির প্রভাব (সুখ-দুঃখ) না পড়া। মুক্তি হয় সুখ-দুঃখ থেকে। সুখ-দুঃখ হলো বিকার, জ্ঞান বিকার নয়। জ্ঞান হবে কিন্তু বিকার হবে না— এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। জ্ঞান না হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়। জ্ঞান মূর্ছিত ব্যক্তিরও হয় না। যারা সাধারণ (বদ্ধ) মানুষ, তাদের মনোবৃত্তি যদি অন্যত্র নিযুক্ত হয় তাহলে তাদেরও পীড়ার জ্ঞান থাকে না। যেসব নারী সতী হন তাঁদেরও ব্যাধির জ্ঞান থাকে না। অত্যন্ত বীরপুরুষেরও যুদ্ধ-পীড়ার জ্ঞান থাকে না। অতএব পীড়ার জ্ঞান না-হওয়া তত্ত্বজ্ঞান অথবা প্রেমের লক্ষণ নয়॥৬৮॥

প্রশ্ন—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ যদি আচরণে জড়িয়ে পড়েন তাহলে কি অহঙ্কার অনিবার্য হয়ে ওঠে ?

উত্তর—না। তিনি অহঙ্কার-রহিত 'ক্রিয়া' করেন। অহঙ্কারযুক্ত 'কর্ম' করেন না—**'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে'** (মুন্ডকোপনিষদ্ ২।২।৮)॥৬৯॥

প্রশ্ন—জীবন্মুক্ত পুরুষের দ্বারা শৌচ-স্নানাদি কর্ম কেমন করে হয় ?

উত্তর—কুম্ভকার যেমন একবার চাকা চালিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেয়, তারপর চাকা নিজেই চলতে থাকে তেমনই পূর্বসংস্কারের বেগে জীবন্মুক্ত পুরুষের শরীর চলতে থাকে, তার আচরণ হতে থাকে। তাৎপর্য হলো, তার দ্বারা সেই রকম আচরণই হয় যা আগে থেকে চলে আসছে। তবে জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর তাতে নির্লিপ্ততা আসে, আর কোনো তফাৎ হয় না। সাধারণ লোকেরা জগৎ-সংসারকে নিত্য মনে করে যেমন আচরণ করে থাকে সেই ভাবেই তত্ত্বজ্ঞানী

জগৎ-সংসারকে অনিত্য মনে করে আচরণ করে থাকেন। তাঁর অনুভূতিতে অন্তঃকরণ সহ সমগ্র সংসার সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়।

জীবনমুক্তের আচরণ তিনটি কারণে হয়ে থাকে—

১। ভাগ্য অনুসারে লাভ করা পরিস্থিতি অনুযায়ী।

২। স্বভাব অনুসারে।[১]

৩। সন্মুখস্থ ব্যক্তি বা জনসমূহের ভাবনানুসারে।

যথাযোগ্য ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও জীবনমুক্ত মহাপুরুষের নির্লিপ্তভাব যেমনকার তেমনি থেকে যায়। তাঁর সকল ক্রিয়া ও আচরণ রাগ-দ্বেষ রহিত হয়ে থাকে॥৭০॥

প্রশ্ন—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের সুখ-দুঃখ, প্রসন্নতা-অপ্রসন্নতা দেখা যায়। এর কী কারণ ?

উত্তর—এ শুধু অন্যের কল্যাণের জন্য অভিনয়ের মতো। যেমন, মা-বাবা তাঁদের সন্তানের উপর রাগ করেন। তা কেবল তাদের ভাল করার জন্য। অনিষ্ট করার জন্য নয়। কিন্তু জীবনমুক্ত পুরুষকে এমন অভিনয়ও করতে হয় না। তার দ্বারা স্বতঃই অন্যের ভাল করার চেষ্টা সম্পাদিত হয়॥৭১॥

প্রশ্ন—মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর কি মহাপুরুষ নিজের মতের সমর্থন এবং অন্যের মতের খণ্ডন করেন ?

উত্তর—হ্যাঁ করেন। কিন্তু তাঁর মনোভাব শুদ্ধ থাকে। লোকেরা যাতে বিপথগামী হয়ে না পড়ে, তাদের যাতে উদ্ধার হয় তার জন্য তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ মত, (সাধন প্রণালী)—যে সম্পর্কে তাঁরা নিঃসন্দেহ, তার প্রচার করেন। তাঁরা রাগ-দ্বেষ বশত খণ্ডন-মণ্ডন (সমর্থন) করেন না। তাঁরা সাধকদের দ্বিধা দূর করবার জন্য খণ্ডন-মণ্ডন করে থাকেন। কেননা সাধকদের যদি সংশয় থাকে তাহলে তাঁরা কোন একটি সাধনায় সম্পূর্ণরূপে লেগে

---

[১]সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ (গীতা ৩।৩৩)

'সকল প্রাণী প্রকৃতিকে লাভ করে। জ্ঞানী মহাপুরুষও নিজের প্রকৃতি অনুসারে কাজ করেন। তাহলে এতে জেদ কী করবে ?'

থাকতে পারেন না॥৭২॥

প্রশ্ন—মুক্ত হয়ে যাবার পরেও যে সূক্ষ্ম অহং থাকে তার স্বরূপ কী?

উত্তর—এক হলো আগ্রহ (অনুরাগ) এবং আর একটি হলো প্রেম। যদি সাধনা, সৎসঙ্গ প্রভৃতিতে আগ্রহ থাকে তাহলে তাতে (সাধনাদিতে) বাধা উপস্থিত হলে ক্রোধ হবে। আর যদি প্রেম থাকে তাহলে বাধা এলে কান্না পাবে— এটি হলো আগ্রহ এবং প্রেমের পরিচয়। বদ্ধ পুরুষদের তো নিজেদের মতের প্রতি আগ্রহ থাকে। কিন্তু মুক্ত পুরুষদের নিজেদের মতের প্রতি প্রেম থাকে। যে সাধনায় মুক্তি লাভ হয় তার প্রতি যে প্রেম এবং কৃতজ্ঞতার ভাব সেইটিই হলো সূক্ষ্ম অহম্ অথবা অহং-এর সংস্কার। এই সূক্ষ্ম অহং-এর দ্বারা কোনো বিকার সৃষ্টি হয় না, কিন্তু তা মতভেদ সৃষ্টি করে। পোড়া কাগজে যেমন অক্ষর দেখা যায় তেমনই মুক্ত পুরুষে অহঙ্কার শূন্য অহং দৃষ্ট হয়। এই সূক্ষ্ম অহং- এর কারণেই মুক্ত পুরুষদের মধ্যে দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি অনেক মতভেদ সৃষ্টি হয়ে থাকে ॥৭৩॥

প্রশ্ন—আচার্যদের মধ্যেকার যে মতবিরোধ তা কি মুক্তির প্রতিবন্ধক?

উত্তর—আচার্যদের মধ্যেকার মতবিরোধ তাঁদের মুক্তির বাধা হয় না। তবে তা নিজেদের মধ্যে মিলন ঘটতে দেয় না।

আচার্যদের মধ্যে তাঁদের নিজস্ব মত পালনের উপরেই বেশি জোর থাকে। অন্যের মতের খণ্ডনের উপর বেশি জোর দেওয়া হয় না। এজন্য তা তাঁদের মুক্তির বাধা হয় না। কিন্তু তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে অন্যের মতকে খণ্ডন করবার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। নিজেদের মত পালনের প্রতি বেশি জোর থাকে না। এজন্য সেই মতবিরোধ তাঁদের মুক্তির বাধক হয়। আচার্যদের মধ্যে অন্যের কল্যাণ করার ভাব বিশেষ ভাবে থাকে॥৭৪॥

প্রশ্ন—মুক্ত হয়ে যাওয়ার পরও যে সূক্ষ্ম অহং থাকে তা কি আবার পতন ঘটাতে পারে?

উত্তর—সূক্ষ্ম অহং থাকলে তার আবার জন্ম হতে পারে, পতন (বন্ধন) হতে পারে না। যেমন, অন্তিম সময়ে জড় ভরত হরিণের চিন্তা করতে থাকায় পরজন্মে তাঁর হরিণের দেহ হয়েছিল, তাতে তাঁর পতন হয়নি। হরিণ জন্মেও

তিনি শুকনো পাতা খেয়ে সংযমের সঙ্গে থাকতেন। শরীর পাওয়া (পুনর্জন্ম) পতন নয়। অন্তিম সময়ে মনোবৃত্তি যদি কোনো বিশেষ শ্রদ্ধাভাজনের দিকে থাকে তাহলে মুক্ত মহাপুরুষদেরও পুনর্জন্ম হতে পারে, কিন্তু তাঁর পতন হতে পারে না॥৭৫॥

প্রশ্ন—মুক্তির পরে স্থিত সূক্ষ্ম অহং কখন দূর হয় ?

উত্তর—পরম প্রেম (পরাভক্তি) লাভ হলে এই সূক্ষ্ম অহং সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। এইজন্য বলা হয়েছে— **প্রেম ভগতি জল বিনু রঘুরাঈ। অভিঅন্তর মল কবহুঁ ন জাঈ**॥ (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকান্ড ৪৯।৩)॥৭৬॥

প্রশ্ন—চৈতন্য মহাপ্রভু তো প্রেমিক ভক্ত ছিলেন, তাহলে তাঁর মধ্যে মতভেদ (অচিন্ত্য ভেদাভেদ) কেন দেখা যায় ?

উত্তর—চৈতন্য মহাপ্রভু কেবল একটি মতই—'প্রেম'-কে স্বীকার করেছিলেন এবং তার মধ্যেও কেবল 'বিপ্রলম্ভ'-কে (বিরহ) প্রাধান্য দিয়েছিলেন— এই মতভেদ তার মধ্যে ছিল। বিরহভাবের প্রতি আগ্রহ থাকায় তাঁর মধ্যে মতভেদ হয়েছিল।

যাঁদের মধ্যে মতভেদ থাকে না তাঁরা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ— এই তিনটির কথাই বলেন। তাঁরা পরমাত্মার সমগ্র রূপকে মানেন। এর মধ্যে সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার প্রভৃতি সমস্ত রূপ এবং সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য প্রভৃতি সকল ভাব এসে যায়॥৭৭॥

প্রশ্ন—ভক্তদের মধ্যেও নিজেদের মতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়, যেমন—ঘন্টাকর্ণ ভগবান শঙ্কর ছাড়া অন্য কোনো নাম শুনতেই চাইতেন না। এর কারণ কী ?

উত্তর—বাস্তবে ভক্তদের নিজেদের বিষয়ে কোনো আগ্রহ থাকে না, ঈশ্বরের প্রতিই আগ্রহ থাকে—

অস অভিমান জাই জনি ভোরে।
মৈ সেবক রঘুপতি পতি মোরে॥

(শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকান্ড ১১।১২)

'ভগবানেরই আশ্রয় নিয়ে থাকায় ভগবান ভক্তের আগ্রহকে দূর করে দেন'॥৭৮॥

প্রশ্ন—জীবন্মুক্ত হয়ে গেলেও কি অন্তিম সময়ের চিন্তানুসারে গতি হয়ে থাকে ?

উত্তর—না। যতক্ষণ অহং থাকে ততক্ষণ অন্তিমকালের চিন্তানুসারে গতি হয়ে থাকে। হ্যাঁ, মুক্ত হয়ে গেলেও যে সূক্ষ্ম অহং থেকে যায় তাতে অন্তিম কালের চিন্তানুসারে জন্ম হতে পারে, কিন্তু পতন হয় না। যেমন, জড় ভরতকে অন্তিমকালে হরিণের চিন্তা করায় হরিণের যোনিতে যেতে হয়েছিল। হরিণের দেহ পেলেও তাঁর পতন হয়নি। নদীর প্রবাহ যেমন স্বতঃই সমুদ্রের দিকে যায় তেমনই ভগবানের চিন্তন মনন থাকার কারণে হরিণের দেহ পেলেও সেই ভাব থেকে গিয়েছিল। আসলে পশু পাখি প্রভৃতির শরীর পাওয়া পতন নয়। প্রত্যুত অন্তরের অবস্থান থেকে নেমে যাওয়াই হলো পতন। অতএব অন্তিম সময়ে অধিক শ্রদ্ধাভক্তি সম্পন্ন কোনো বিশেষ প্রিয়জনের প্রতি মনোবৃত্তি হলে মহাত্মাদেরও পুনর্জন্ম হতে পারে। কিন্তু পতন হতে পারে না॥৭৯॥

প্রশ্ন—তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে কি জগৎকে স্বপ্নের মতো মিথ্যা বলে মনে হয় ?

উত্তর—বিবেকবান সাধকের কাছে জগৎ স্বপ্নের মতো মনে হয়। তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগৎ-ই নেই। তাঁর দৃষ্টিতে এক পরমাত্মা ছাড়া আর কিছু নেই— **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)॥৮০॥

প্রশ্ন—মুক্ত পুরুষদের কি 'আমি সর্বগত' এমন অনুভূতি হয় ?

উত্তর—আমি সর্বগত (সর্বব্যাপী)— উচ্চ অবস্থার সাধকদের এমন অনুভূতি হয়। মুক্ত হয়ে গেলে তো আমিত্ব চলে যায় এবং একটি সত্তা ছাড়া আর কিছু থাকে না। তার কারণ যখন 'সর্ব'-এর সত্তা নেই তখন সর্বগতের অনুভূতি হবে কী করে ? ॥৮১॥

প্রশ্ন—জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ কি সর্বজ্ঞ হন ?

উত্তর—যিনি করণসাপেক্ষ শৈলীর দ্বারা (যোগাভ্যাস করে) সিদ্ধ হয়েছেন তিনি সর্বজ্ঞ হতে পারেন। কিন্তু যিনি করণনিরপেক্ষ শৈলীর দ্বারা (সম্বন্ধ-বিচ্ছেদপূর্বক) সাধনা করেছেন তিনি সর্বজ্ঞ হন না। সর্বজ্ঞ হওয়াকে তিনি কোনো গুরুত্ব দেন না।

স্বয়ং-এ 'সর্ব'-এর অর্থাৎ প্রকৃতির সত্তাই নেই, সর্বজ্ঞতা আছে প্রকৃতিতে। মহাপুরুষের দৃষ্টিতে 'সর্ব' ই নেই, কেননা তাঁর দৃষ্টিতে এক

পরমাত্ম-তত্ত্ব ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সত্তাই নেই। প্রকৃতিতে স্থিত হওয়ার পর তিনি সর্বজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ হন।

মহাপুরুষেরা সর্বজ্ঞ তো হন না। কিন্তু অন্য মানুষদের প্রবল আগ্রহের কারণে তাঁদের হৃদয়ে ভবিষ্যতের কোনো কোনো কথা স্বতঃই দৃষ্ট হতে পারে॥৮২॥

প্রশ্ন—তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে জগতের তো অস্তিত্বই নেই। তাহলে দুঃখীদের দুঃখিত দেখে তাঁদের কেন দুঃখ হয় ?

উত্তর—দুঃখ হয় না, কেবল আচরণ হয়। সেই অনুসারে ব্যবহারে লোকেদের মনে হয় যে তাঁদের দুঃখ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের ভিতর দুঃখ নেই। কিন্তু আচরণে তাঁদের মধ্যে অন্যের দুঃখ দূর করার চেষ্টা থাকে। তাৎপর্য হলো, তাঁরা দুঃখিত হন না, কিন্তু দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করে থাকেন যেমন সাধারণ মানুষেরা করে।

অপরের সুখ-দুঃখে সুখী এবং দুঃখিত হওয়া হলো ভোগ, তা যোগ নয়। মহাত্মাদের মধ্যে ভোগ থাকে না, বরং যোগ থাকে। তাঁরা দর্পণের মতো সুখ-দুঃখকে আঁকড়ে থাকেন না। যোগে স্বয়ং সুখী কিংবা দুঃখিত হয় না তবে তদনুসারে চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টা কর্মযোগী এবং ভক্তিযোগীর মধ্যে বিশেষ করে হয়। জ্ঞানযোগী নিরপেক্ষ থাকেন, তাঁর মধ্যে সমতা (নির্লিপ্ততা) থাকে॥৮৩॥

প্রশ্ন—জীবন্মুক্ত হওয়ার পরেও কি তাঁর কোন 'ধর্মী' থাকে ? তিনি কি কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখেন ?

উত্তর—হ্যাঁ, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখেন। তাঁর মধ্যে 'আমি জীবন্মুক্ত হয়েছি, অন্যে হয়নি' এই ভেদ থাকে। যদি তাঁর দৃষ্টিতে 'সকলে জীবন্মুক্ত' এমন ধারণা থাকে তাহলেও 'অন্যের মধ্যে বন্ধনের ভুল ধারণা আছে আমার মধ্যে নেই'-এই ভেদ থেকেই যায়। তাই গীতায় জীবমুক্তের জন্যও **'স সর্ববিদ্ ভজতি'** (১৫।১৯) পদে ভজন করবার কথা বলা হয়েছে।

জীবনমুক্তির পরেও অনেক দূর পর্যন্ত 'ধর্মী'- ভাব থাকে। প্রেম লাভ হয়ে গেলে 'ধর্মী' থাকে না। ধর্মীভাব না থাকলেও স্বভাব- ভেদ থেকেই যায়— **'সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি'** (গীতা ৩।৩৩)। পরশপাথর দিয়ে

যদি তরবারিকে স্পর্শ করা হয় তাহলে তরবারির মার, ধার এবং আকারের পরিবর্তন হয় না, কেবল ধাতুর পরিবর্তন হয়। এজন্য ভগবান সিদ্ধ ভক্তের লক্ষণগুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন (গীতা ১২।১৩-১৪, ১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮-১৯)। ভগবান **'প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাম্'** (গীতা ১০।৩০) 'দৈত্যদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ' এই পদগুলির দ্বারা বর্তমানকালের প্রয়োগ করেছেন। এতে ভক্তদের পৃথক্ অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। **'সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ'** (গীতা ১৪।২) 'জ্ঞানী মহাপুরুষেরও জন্ম মহাসর্গতেও হয় না এবং তিনি মহাপ্রলয়েও ব্যথিত হন না'—এই পদগুলিতে মহাপুরুষদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

তত্ত্বজ্ঞান হলে নিজের সত্তার বিনাশ হয় না। বরং নিজের পরিচ্ছিন্নতার জড়-চেতনার গ্রন্থির বিনাশ হয়।

প্রাণিমাত্রের কল্যাণের প্রতি যাঁদের আগে থেকে অনুরাগ থাকে সেই মুক্ত মহাপুরুষদের ভগবান কারক-পুরুষরূপে পাঠান। তাতে এই প্রমাণ হয় যে মুক্ত হয়ে গেলেও তাঁদের ভিন্ন সত্তা দূর হয়নি।

ভগবানে লীন হওয়ার অর্থ এই নয় যে ভক্তের কোনো সত্তাই থাকে না। একজন মূর্খ বিদ্বান হয়ে গেলে তার কি অস্তিত্ব দূর হয়ে যায় ? ভগবানে লীন হওয়ার অর্থ — ভগবানের রূপে অবতার হওয়া। যেমন, ভগবান কচ্ছপ, বরাহ প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হলেও তাতে তাঁর সত্তা তো বিনষ্ট হয় না। ভগবানে লীন হওয়া অথবা তাঁর লোকে অবস্থান করা — দুটিই নিত্য এবং তা ভক্তের ভাবানুসারে হয়। প্রকৃত বিষয় অনুভূতি হলে জানা যায়॥৮৪॥

প্রশ্ন—কারক পুরুষ কে ?

উত্তর—যাঁরা মুক্ত হয়ে গিয়েছেন, ভগবানকে লাভ করেছেন তাঁদের মধ্য থেকেই ভগবান তাঁদের স্বভাব অনুসারে কাউকে কারক-পুরুষ অর্থাৎ কাউকে যমরাজ অথবা ব্রহ্মা করেন।'কারক'-এর অর্থ হলো— কল্যাণকারী। যাঁদের স্বভাবে আগে থেকেই প্রাণিমাত্রের কল্যাণ করার প্রবণতা ছিল ভগবান তাঁদের কারক-পুরুষ করে পৃথিবীতে পাঠান। কারক-পুরুষের জন্ম ভগবানের অবতারের মতো কর্মের অধীন হয় না, তা ভগবানের ইচ্ছাধীন হয়। তাঁদের

শরীরে কোনোও ব্যাধি হয় না। বেদব্যাস এই রকম একজন কারক-পুরুষ ছিলেন।।৮৫।।

প্রশ্ন—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা কি মৃত্যু থেকে বাঁচবার চেষ্টা করেন ?

উত্তর — যেমন অন্যদের বাঁচাবার চেষ্টা থাকে তেমনই নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টাও থাকে। কিন্তু বাঁচা বা মরা, এর মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না। তার কারণ তাঁদের বাঁচার ইচ্ছাও থাকে না আবার মরবার ভয়ও থাকে না। তাঁদের মধ্যে ইচ্ছা এবং ভীতি রহিত স্বাভাবিক চেষ্টা থাকে। যেমন, ঘুমের মধ্যে শরীরের কোন স্থানে মশা কামড়ালে হাতটা সেখানে নিজে থেকেই যায়, ঠান্ডা লাগলে হাত স্বভাবতঃই কম্বল আশ্রয় করে।।৮৬।।

প্রশ্ন—কেউ যদি মহাপুরুষের দর্শন পায় তাহলে তাতে কি তার কল্যাণ হবে ?

উত্তর — ভক্তের, জীবন্মুক্ত পুরুষের অথবা ভগবানের দর্শন হলেই কল্যাণ হয়ে যাবে এমন মনে হয় না। দুর্যোধন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একজন সচতুর ব্যক্তি মনে করত। তাই তার সচতুর ব্যক্তিরই দর্শন হয়েছিল, ভগবৎ দর্শন হয়নি। তাৎপর্য হলো, কল্যাণ হওয়ার ক্ষেত্রে ভাবেরই প্রাধান্য থাকে। নিজের ভাবনা (শ্রদ্ধা প্রীতি) যদি একাগ্র থাকে তাহলে কল্যাণ হতে পারে।।৮৭।।

প্রশ্ন—পিতামহ ভীষ্ম জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। তবু দুর্যোধনের অন্ন খাওয়ায় তাঁর বুদ্ধি কি করে অশুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ?

উত্তর—মানুষ জীবন্মুক্ত হলে তার শরীর সংসার থেকে আলাদা হয়ে যায় না, সে নিজে শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। তাই অশুদ্ধ অন্ন ভক্ষণ করলে জীবন্মুক্ত পুরুষের বৃত্তিও অশুদ্ধ হতে পারে। তবে সেই বৃত্তি সাময়িক হয়, স্থায়ী হয় না। পিতামহ ভীষ্মের জীবন থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, মানুষের অশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়।।৮৮।।

~~O~~

তত্ত্বজ্ঞান

প্রশ্ন—তত্ত্বজ্ঞান হলে পার্থক্য কিসে হয় ?

উত্তর — তত্ত্বজ্ঞান হলে স্বয়ং-এ (আত্মা) পার্থক্য হয় না, অন্তকরণেও (মন-বুদ্ধি) হয় না। প্রকৃত পার্থক্য হয় নিজের ধারণায় যা বুদ্ধিতে পরিদৃষ্ট হয়।

বন্ধন এবং মুক্তি দুটিই কর্তাতে থাকে অর্থাৎ মুক্তির ধারণা (সিদ্ধান্ত) হয় স্বয়ং-এ। স্বয়ং এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়॥৮৯॥

প্রশ্ন—তত্ত্বজ্ঞান এবং তত্ত্বনিষ্ঠার মধ্যে কী পার্থক্য ?

উত্তর—তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর তত্ত্বনিষ্ঠা হতে সময় লাগে। কিন্তু মুক্তির সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। তত্ত্বজ্ঞানে কিছু কোমলতা থাকে। কিন্তু তত্ত্বনিষ্ঠায় স্বাভাবিক ভাবেই দৃঢ়তা থাকে। যেমন ঘুম চলে গেলে চোখ কিছুক্ষণ ভারী থাকে। চোখ আলো সহ্য করতে পারে না। অনুরূপভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরও কিছু সংস্কার থেকে যায়। কিন্তু তত্ত্বনিষ্ঠা এলে আর সেই সংস্কার থাকে না।

তত্ত্বজ্ঞানের উপমা জলে দাগ টানার মতো আর তত্ত্বনিষ্ঠার উপমা আকাশে দাগ অঙ্কন করার মতো। গীতাতে **'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ'** (৫।২০) পদের অন্তর্গত **'ব্রহ্মবিদ্'** পদের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানকে এবং **'ব্রহ্মণি স্থিত'** পদ দুটির দ্বারা তত্ত্বনিষ্ঠা হওয়ার কথা বোঝান হয়েছে॥৯০॥

প্রশ্ন—তত্ত্ববোধ হলে নিষ্ঠা নিজে থেকে আসে, নাকি তার জন্য কিছু করতে হয় ?

উত্তর—নিষ্ঠা স্বতঃই এসে যায়। তত্ত্বনিষ্ঠা আসতে নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে কম অথবা বেশি সময় লাগে। যেমন, শরীরের প্রকৃতি ভিন্নরূপ হওয়ায় কারও অসুখ হলে তাড়াতাড়ি সেরে যায় আবার কারও সারতে সময় লাগে। সাধক অনস্তিত্বকে যত বেশি গুরুত্ব দেয় ততই সময় লাগে আর যতই নিশ্চিন্ত থাকে ততই নিষ্ঠা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়॥৯১॥

প্রশ্ন—রাজা জনকের ঘোড়ার জিনে পা রাখার সময়টুকুর মধ্যেই তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে তৎকালেই তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার কারণ কী ?

উত্তর—জিজ্ঞাসা তীব্র হবে, বর্তমান অবস্থার প্রতি সন্তুষ্টি থাকবে না, নিজের মধ্যেকার সীমাবদ্ধতার ধারণা থাকবে এবং তা অসহনীয় বোধ হবে — এরূপ হলে কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। শ্রদ্ধা গভীর হলেও তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাবে। যেমন, সাধু বললেন যে অমুক জিনিসটা সোনার আর

সেইটিকে সেই রকম (সোনা) দেখতে থাকা॥৯২॥

প্রশ্ন—তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গেলে স্বয়ং-এর সমস্ত শক্তি কি প্রকট হয় ?

উত্তর—স্বয়ং-এর মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হলে সকল শক্তিই প্রকটিত হয় না। তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ 'জুঞ্জান' যোগী হন। সেজন্য যেখানে তিনি বৃত্তিকে নিয়োজিত করেন সেই শক্তিই প্রকট হয়॥৯৩॥

প্রশ্ন—সাত্ত্বিক জ্ঞান এবং তত্ত্ব জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কী ?

উত্তর—সাত্ত্বিক জ্ঞানে সঙ্গ আছে—**'সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ'** (গীতা ১৪।৬), কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গ। সাত্ত্বিক জ্ঞানে দ্রষ্টা (যে দেখে) থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে দ্রষ্টা থাকে না। সাত্ত্বিক জ্ঞানে 'আমি জ্ঞানী' নিজের মধ্যে এই রকম বৈশিষ্ট্যের ধারণা হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে (জ্ঞানী অর্থাৎ অহং ভাব না থাকায়) নিজের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব দেখা যায় না॥৯৪॥

প্রশ্ন—তপস্যায় কি ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে ?

উত্তর—তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান পরম্পরা ক্রমে হতে পারে, প্রত্যক্ষভাবে হয় না। বেদান্তে জ্ঞান লাভের জন্য আটটি অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বলা হয়েছে—বিবেক, বৈরাগ্য, শমাদি ষড়গুণ সম্পত্তি, মুমুক্ষুতা, শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসন এবং তত্ত্ব পদার্থ সংশোধন। তপস্যা জ্ঞান লাভের অন্তরঙ্গ সাধন নয়। তা বহিরঙ্গ মাত্র।

গীতাতে জ্ঞানকেও তপ বলে বলা হয়েছে—**'বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ'** (৪।১০)। শারীরিক তপ সাধনাতে সহায়তা করতে করে কিন্তু তার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে না। শারীরিক তপস্যায় অহঙ্কারও সৃষ্টি হতে পারে॥৯৫॥

প্রশ্ন—জ্ঞান তো অনন্ত। তাহলে 'তত্ত্বজ্ঞান হলে জানার কিছু বাকি থাকে না'— একথা বলার অর্থ কী ?

উত্তর—বাস্তবে জ্ঞান অনন্ত। তাই 'তত্ত্বজ্ঞান হলে জানার কিছু বাকি থাকে না' এমন বলার তাৎপর্য হলো এই যে আমার জিজ্ঞাসা শেষ হয়ে গিয়েছে। যেমন, আমরা বলি যে আমরা জল খেয়ে নিয়েছি। এর অর্থ এই নয় যে পৃথিবীতে আর জল নেই। আসলে এর অর্থ হলো আমাদের তৃষ্ণা মিটে গিয়েছে॥৯৬॥

প্রশ্ন—তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার পরেও কি জ্ঞান বৃদ্ধি হতে থাকে ?

উত্তর — তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গেলে বোধে কোনো রকম তফাৎ হয় না কিন্তু যতক্ষণ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের শরীর থাকে ততক্ষণ আগেকার অভ্যাস অথবা স্বভাবের কারণে তার বিবেক (আচরণে) বর্ধিত হতে থাকে। বিবেক বর্ধিত হলে তার বিবেচনা শক্তিও স্পষ্ট ও উত্তম হয় এবং তার মধ্যে নতুন নতুন দৃষ্টান্ত, যুক্তি আসে। গ্যাস বাতির মেন্টল পুড়ে যাবার পর যেমন আলো বিশেষভাবে প্রকাশিত হয় তেমনই তত্ত্ববোধ হওয়ার পর সেই মহাপুরুষের বিবেক বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। এই বৈশিষ্ট্য চেতনে (স্বরূপে) আসে না, জড় (আচরণ)-এ আসে। তার কারণ তত্ত্ববোধ হলে জড় চেতনের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয়ে যায় অর্থাৎ জড় ও চেতনার গ্রন্থি ছিঁড়ে যায়॥ ৯৭ ॥

~~○~~

দান

প্রশ্ন—মৃত্যুর পর চক্ষু দান করা কি উচিত ?

উত্তর—সম্পূর্ণরূপে অনুচিত। সম্পত্তি দান করার অধিকার যেমন প্রাপ্ত-বয়স্কের থাকে, নাবালকের থাকে না ; তেমনই শরীরের কোনো অংশ দান করার অধিকার জীবন্মুক্ত মহাপুরুষরদেরই থাকে। যাঁরা নিজেদের মুক্ত (কল্যাণ) করে নিয়েছেন, নিজেদের মনুষ্যজীবন সফল করেছেন তাঁরাই সাবালক, বাকি সবাই নাবালক। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষও শরীর থাকাকালীন চক্ষু দান করতে পারেন, শরীর ত্যাগের পর দান করার অঙ্গীকার করতে পারেন না।

শবদেহকে ক্ষতবিক্ষত করা ঠিক নয়। শবের কোনো অঙ্গচ্ছেদ করলে পরের জন্মে সেই অঙ্গ পাওয়া যায় না। আর পাওয়া গেলেও তাতে কিছু ত্রুটি থাকে। কোনো কোনো ব্যক্তির পূর্বজন্মের চিহ্ন এই জন্মেও দেখা গিয়েছে। শিশুর মৃত্যুর পর মা তার দেহের কোনো অঙ্গে রসুন লাগিয়ে দেয়। তাতে পরজন্মে সেই চিহ্ন থেকে যায়॥৯৮॥

প্রশ্ন—নিজের বস্তুই দান করা হয়-'স্বস্বত্বপরিত্যাগপূর্বক পরসত্ত্বোৎপাদনম্ দানম্'-তবু কর্মযোগী কোনো বস্তুকে নিজের মনে না

করলেও তা দিয়ে অন্যের সেবা করেন— এ কেমন কথা ?

উত্তর—বস্তুকে নিজের মনে করলে কামনা হয়। যার জিনিস তাকেই দিয়ে দিলে তা কামনা হয় না। কামনা করা বেইমানী। আসলে কোনো কিছুই নিজের নয়। যা কিছু আমাদের কাছে আছে তা আমাদের পাওয়া এবং তা থাকবে না। অতএব যা পেয়েছি তা অন্যের সেবার জন্যই পাওয়া।

যে বস্তু বাস্তবে নিজস্ব তা কখনও ত্যাগ করা যায় না। স্বরূপকে কি ত্যাগ করা যায় ? সূর্য কি তার কিরণ ত্যাগ করতে পারে ? পারে না। সেই জিনিসেরই ত্যাগ হয় যা নিজের নয় কিন্তু ভুল করে নিজের মনে করা হয়েছে। অতএব নিজের মনে করে যে ত্যাগ তা রাজস-তামস ত্যাগ। তাতে মুক্তি হয় না॥৯৯॥

প্রশ্ন—স্বামী দান করতে বারণ করলে স্ত্রী কি লুকিয়ে দান করতে পারেন ?

উত্তর—দান করা দোষের নয়। কিন্তু লুকিয়ে দান করা দোষের। স্ত্রীর উচিত স্বামীর কাছ থেকে প্রতি মাসে কিছু অর্থ নেওয়া এবং তা থেকে অর্থাৎ নিজের অধিকারের অর্থ থেকে দান করা। নিজের অংশের উপর তো তার অধিকার থাকেই।

স্বামী প্রভৃতিকে লুকিয়ে দান করা 'গুপ্ত দান' নয়, তা হলো চৌর্য। গুপ্ত দান তাকেই বলে যেখানে গ্রহীতা জানতেই পারে না যে দাতা কে ? ॥১০০॥

প্রশ্ন—কোনো কোনো লোক নিজেদের ছেলেমেয়েদের, স্ত্রীদের জিনিস না দিয়ে অন্যদের দেয়, অন্যদের সেবা করে। এটা কি উচিত ?

উত্তর—এই সব লোক বাস্তবে নিজেদের কল্যাণ চায় না, তারা চায় মান-সম্মান। জিনিসের উপর পরিবারের লোকেদের সর্বপ্রথম অধিকার। যে আমাদের যত কাছের তার ততই বেশি অধিকার, সে ততই সেবা পাওয়ার অধিকারী। পরিবারের প্রত্যেকের কাছে আমরা ঋণী। প্রথমে ঋণ মেটান উচিত, দান পুণ্য হবে পরে॥১০১॥

প্রশ্ন—নিজের ঋণ থাকা সত্ত্বেও কি দান-পুণ্য করতে পারা যায় ?

উত্তর—ঋনগ্রস্তের পুণ্য-দান করবার অধিকার নেই। এজন্য প্রথমেই ঋণ মিটিয়ে দেওয়া উচিত। তবে পুণ্য-দান যদি করতেই হয় তাহলে নিজেদের খাওয়া পরার খরচ থেকে তা করতে হবে॥১০২॥

প্রশ্ন—মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণকে শয্যা, বস্ত্র প্রভৃতি দান করলে ব্রাহ্মণ সেগুলি বেচে দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে, এটি কি ঠিক ?

উত্তর —দানে পাওয়া কোনো জিনিস ব্রাহ্মণের বিক্রি করা উচিত নয়, সেগুলিকে নিজের কাজে লাগান উচিত। সে যদি সেগুলি বিক্রি করে তাহলে তাতে তার পাপ হয়। আর যে সেগুলি কেনে সে মৃতের আত্মার কাছে ঋণী হয়ে যায়।

যদি পুরোহিত ব্রাহ্মণের শয্যাদি বস্তুর প্রয়োজন না থাকে তাহলে যজমান সেই ব্রাহ্মণকে দিয়ে সংকল্প করিয়ে নেবেন এবং ঐ বস্তুগুলি গরীব, অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে দেবেন। যদি পুরোহিত ব্রাহ্মণ তা করতে রাজী না হন তাহলে যজমান তাঁকে সেই বস্তুগুলি দিয়ে দেবেন এবং তাদের মূল্য দিয়ে সেগুলি ফিরিয়ে নেবেন ও সেগুলি অন্য গরীব ব্রাহ্মণকে দিয়ে দেবেন। তা করলে পুরোহিত ব্রাহ্মণ পয়সা পাবেন এবং গরীব ব্রাহ্মণ বস্তুগুলি পেয়ে উপকৃত হবেন। তাৎপর্য হলো বস্তু তাকেই দিতে হবে যে এইগুলি নিজের কাজে লাগাবে॥১০৩॥

প্রশ্ন—পয়সা দিয়ে জিনিস কিনলে তো দোষ হয় না। তাহলে পুরোহিত ব্রাহ্মণের কাছ থেকে জিনিস কিনলে মৃতাত্মার কাছে কেন ঋণী হতে হবে ?

উত্তর—সে সস্তায় জিনিসগুলি কেনে, তাই তার দোষ হয়। যদি সওয়া গুণ- দেড় গুণ বেশি দাম দিয়ে কেনে তাহলে দোষ হয় না॥১০৪॥

~~○~~

দোষ (কাম-ক্রোধাদি)

প্রশ্ন—যেমন দ্রবীভূত মোমে যে রঙ দেওয়া হয় সেটিই তাতে বসে যায়, সেই রকম দ্রবীভূত হৃদয়ে যে কামাদি দোষ স্থায়ী হয়ে গিয়েছে তাকে কী করে দূর করা যাবে ?

উত্তর—দ্রবীভূত হৃদয়ে কাল শ্যামসুন্দরকে বসিয়ে দাও। কাল রঙে সব রঙ মিশে যায়॥১০৫॥

প্রশ্ন—দোষ আসে এবং যায়। কিন্তু এমন মনে হয় যে দোষ কোথাও থেকে আসে না। নিজের ভিতরেই থাকে এবং কখনও কখনও জেগে ওঠে।

উত্তর—দোষ অন্তঃকরণে স্বভাবের রূপে, সংস্কারের রূপে থাকে এবং অন্তঃকরণে জেগে ওঠে। কিন্তু অন্তঃকরণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ায় সেই দোষগুলিকে আমরা নিজেদের বলে মনে করি। সেজন্য ঐ দোষগুলি যাতে নিজেদের বলে মনে না করি তার জন্য সাধকদের সাবধান থাকতে হবে। কারণ বাস্তবে দোষ নিজস্ব হয় না। স্বরূপ হলো নির্দোষ॥১০৬॥

প্রশ্ন—একবার বলা হয় যে স্বরূপ নির্দোষ, আবার একথাও বলা হয় যে '*মো সম কৌন কুটিল খল কামী*' (আমার মতো কুটিল, খল, কামনার্ত আর কে আছে?)— দুটির মধ্যে কোন কথাটি ঠিক ?

উত্তর—দুটিই ঠিক। কেননা দুটির লক্ষ্যই এক এবং তা হলো নির্দোষ হওয়া। প্রথম কথাটি জ্ঞানের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে আর দ্বিতীয়টি বলা হয়েছে ভক্তির দৃষ্টিতে। নিজেদের স্বরূপের দিকে দেখলে দেখা যাবে যে তা নির্দোষ। ভক্ত ভগবানের কাছে নিজের দোষগুলির কথা যখন বলে তখন তার উদ্দেশ্য দোষগুলি রেখে দেওয়া নয় বরং তা দূর করা। ভগবানের কাছে কি কোনো দোষ টিকতে পারে ?

'মো সম কৌন কুটিল খল কামী'—এসব বলা নিজের মধ্যে দোষগুলি স্থাপনা করা নয়। সেগুলিকে ভগবানের সামনে রাখা। সেগুলিকে আগুনে ভস্মীভূত করা।

যিনি সাধক তাঁর কাছে নিজের সামান্য দোষও বড় দেখায়। তা চক্ষুগোলকের সমান হয় —**'অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনম্'** (যোগদর্শন ২।১৯ এর ব্যাসভাষ্য)। যেমন পীঠের উপর কুটি পড়লে কোনো ব্যথা হয় না, কিন্তু চোখে যদি খুব ছোট কুটি পড়ে তা ব্যথা দেয়॥১০৭॥

প্রশ্ন—সর্বতোভাবে নির্দোষ জীবন কী করে পাওয়া যাবে ?

উত্তর—নির্মম-নিরহঙ্কার হলে সম্পূর্ণ নির্দোষ জীবন পাওয়া যাবে। কেননা অহং ও মমত্ব হলো সকল দোষের আবাস॥১০৮॥

প্রশ্ন—যে বস্তুগুলি বিজাতীয় সেগুলির মধ্যে মমতা, কামনা, আসক্তি কেন হয় ?

উত্তর—বিজাতীয় শরীরকে নিজের স্বরূপ মনে করে আমরা স্বজাতীয় করে

নিয়েছি। সেজন্য মমতা, কামনা, আসক্তি হয়॥১০৯॥

প্রশ্ন—ক্রোধ এলে কী করতে হবে ?

উত্তর—চুপ করে থাকতে হবে। কথা বললে রাগ বাড়ে, চুপ করে থাকলে রাগ শান্ত হয়ে যায়। যদি না বলে থাকা না যায় তাহলে মুখে ঠান্ডা জল ভরে নাও এবং সেটিকে কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে পান কর। জলে ক্রোধরূপী আগুন শান্ত হয়ে যায়।

মূলত ক্রোধ অহঙ্কার এবং কামনা থেকে উৎপন্ন হয়—**'কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে'** (গীতা ২।৬২)। যখন অহঙ্কার রূপী ফোড়ায় ধাক্কা লাগে অথবা মনের বিরোধী কোনো কথা হয় তখন রাগ হয়। এজন্য অহঙ্কার এবং কামনা ত্যাগ করতে হবে।

শরীর জগতের এবং আমি ভগবানের। আমি সর্বতোভাবে শরীর থেকে ভিন্ন। এই ভাবে বিবেক জাগ্রত হলে রাগ হবে না। বড়র ওপর যদি রাগ হয় তাহলে তাঁর চরণে পতিত হয়ে বলতে হবে যে আমার রাগ হয়েছিল, ক্ষমা চাইছি।

সৎসঙ্গ করলে স্বভাবের সংশোধন হয় এবং কাম ক্রোধাদি দোষ কমতে থাকে॥১১০॥

প্রশ্ন—কামবৃত্তির নাশ কী করে হবে ?

উত্তর—শরীরের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক মেনে নিলে কামবৃত্তি সৃষ্টি হয়। আমাদের স্বরূপ সত্তামাত্র। শুধুমাত্র সত্তার দিকে লক্ষ্য থাকলে কামবৃত্তির বিনাশ হয়ে যায়। তার কারণ সত্তাতে বিকার নেই এবং বিকারে সত্তা নেই।

বিবেক-বুদ্ধি সহকারে ভেবে দেখলে অথবা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেও 'কাম' থেকে বাঁচা যায়। মনকে দৃঢ় করলেও 'কাম' দূর হয়। যেমন আগেকার যুগে কেবল রাজারাই নয়, ডাকাতেরাও মেয়েদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত না, এটি ছিল তাদের মনের দৃঢ়তা।

'কাম' নিরসতা থেকেও উৎপন্ন হয়। যেমন, কুকুর যখন মাংস পায় না তখন সে শুকনো হাড় চিবোয়। তাতে তার মুখ থেকে রক্ত বার হয় আর তাতেই সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এই রকম নিরসতায় মানুষ মনে করে যে সামান্য

ভোগ্য পেলেও তো কিছু সুখ নিতে পারব ! যদি ভগবানে ভালোবাসা জন্মায় তাহলে নিরসতা দূর হয়ে যাবে আর নিরসতা দূর হলে 'কাম'ও থাকবে না॥১১১॥

প্রশ্ন—সব কিছুই তো ভগবান। তাহলে 'কাম'ও ভগবানের স্বরূপ। তবে তা নিষিদ্ধ কেন ?

উত্তর—মৃত্যুও ভগবানের স্বরূপ—**'মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্'** (গীতা ১০।৩৪), তাহলে কেউ কি জেনেশুনে মরতে চাইবে ? নরকও ভগবানের স্বরূপ, তাহলে কেউ কি নরকে যেতে চাইবে ? কিন্তু মানুষের লক্ষ্য হলো সর্বদা নিজের কল্যাণ, আনন্দ ; দুঃখ নয়। সেজন্য নিষিদ্ধ কর্ম কখনও করা উচিত নয়॥১১২॥

প্রশ্ন—মমতা দূর করবার উপায় কী ?

উত্তর—মমতা কামনা দূর করবার জন্য কোনো শ্রমসাধ্য সাধনার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলো চিন্তা। যা পাওয়া যায় কিন্তু থাকে না সেরূপ বস্তু নিজের নয়, এই চিন্তা করতে হবে॥১১৩॥

প্রশ্ন—কারও মধ্যে দোষ দেখলে কী করা উচিত ? তাকে সংশোধন করব, উপেক্ষা করব নাকি প্রভুর লীলা বলে মানব ?

উত্তর—তাকে সংশোধন করার চেষ্টা কর, আর সে যদি না শোনে তাহলে প্রভুর লীলা মনে করে উপেক্ষা কর॥১১৪॥

প্রশ্ন—কোনো মানুষই খারাপ নয়, এ কেমন ?

উত্তর—সকল জীবই পরমাত্মার অংশ— **'মমৈবাংশো জীবলোকে'** আর পরমাত্মার অংশ খারাপ হতে পারে না। খারাপ তো আগন্তুক অর্থাৎ সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধবশত এসেছে। মূলে তা নেই। খারাপের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। ভালর ন্যূণতাকেই খারাপ বলা হয়॥১১৫॥

প্রশ্ন—কারও খারাপ দেখা যদি দোষ হয় তাহলে খারাপ না দেখে গুরু শিষ্যের, পিতা পুত্রের সংশোধন কেমন করে করবেন ?

উত্তর—অন্যকে নির্দোষ করবার মনোভাব নিয়ে দোষ দেখা দোষ নয়। দোষ হলো খারাপটা দেখে খুশি হওয়া। গুরু শিষ্যের এবং পিতা পুত্রের খারাপ

দেখে খুশি হন না। তাঁরা দুঃখিত হন এবং শিষ্য বা পুত্রকে নির্দোষ দেখতে চান॥১১৬॥

~~○~~

ধর্ম

প্রশ্ন—ধর্মের মূল কী ?

উত্তর—স্বার্থ ত্যাগ এবং অপরের হিতসাধন করা॥১১৭॥

প্রশ্ন—ধর্মের প্রচার কী করে করব ?

উত্তর—নিজে ধর্মপথে চল—এর চেয়ে বড় ধর্ম প্রচার আর নেই॥১১৮॥

প্রশ্ন—ধর্মেরই জয় হয়, কিন্তু আজকাল কোথাও কোথাও অধর্মের বিজয় এবং ধর্মের পরাজয় কেন দেখতে পাওয়া যায় ?

উত্তর—যখন মানুষ সুখাসক্তির কারণে অসৎ-কে গুরুত্ব দেয় তখনই পরাজয় হয়। বাস্তবে পরাজয় হয় না, তবে দেখায় যে হার হয়ে গেল ! ॥১১৯॥

~~○~~

নামজপ

প্রশ্ন—পাপ তো অনেক দিনের পুরাতন আর নাম জপ এখন আরম্ভ করেছি। নতুন নামজপে কি পুরাতন পাপ মোচন হবে ?

উত্তর—এতে নতুন না পুরাতন, না কম না বেশি—সেসব কিছু দেখা হয় না। নতুন তো পুরাতনের জন্যই হয়। গুহার শত শত বৎসরের অন্ধকার আলো ফেলা মাত্র অপসারিত হয়। মন মন তুলা একটা দেশলাই কাঠিতে পুড়ে যায়। যে জিনিসের সঙ্গে অদ্যাবধি (জ্ঞান) পরিচয় হয়নি খুব তাড়াতাড়িই তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়॥১২০॥

প্রশ্ন—চব্বিশ ঘন্টা অবিরাম নাম জপ করলে কি ভগবানের দর্শন হতে পারে ?

উত্তর—নাম জপ করতে করতে যদি দর্শনের আগ্রহ জেগে ওঠে তাহলে

দর্শন হতে পারে। বাস্তবে দর্শন হয় আগ্রহ থেকে, ক্রিয়ার দ্বারা নয়। সংসারের প্রতি বিমুখ হলে আগ্রহ হয়॥১২১॥

প্রশ্ন—কতটা জপ করলে ভগবানের দর্শন হয় ?

উত্তর—কলিসন্তরণোপনিষদে আছে যে **'হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে'**—এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্রটি সাড়ে তিন কোটি জপ করলে ভগবানের দর্শন লাভ হয় । কিন্তু এরকম কোনো নিয়ম নেই। সাড়ে তিন কোটির চেয়েও বেশি জপ করার মানুষকে আমি দেখেছি। কিন্তু তাঁদের ভগবৎ দর্শন হয়নি। তার কারণ হলো ভগবানের দর্শনে ক্রিয়ার প্রাধান্য নেই। বরং ভাবের, প্রেমের, আগ্রহের (লালসার) প্রাধান্য আছে। সেজন্য প্রেম কম থাকলে সাড়ে তিন কোটি জপ করলেও দর্শন হয় না এবং প্রেম অধিক থাকলে কম জপ করলেও দর্শন হয়ে যায়। সংখ্যা এই জন্য জানানো হয়েছে যেন আলস্য দোষ না ঘটে ।

যদি উদ্দেশ্য তীব্র থাকে এবং নিজের শক্তির অহঙ্কার না থাকে তাহলে একবার নাম উচ্চারণেই ভগবৎলাভ হতে পারে —**'নিরবল হৈ্ব বলরাম পুকার্যো আয়ে আধে নাম'**। সংখ্যার (ক্রিয়ার) দিকে মন থাকলে জপ নির্জীব (নিষ্প্রাণ) হয় এবং ভগবানের দিকে লক্ষ্য থাকলে সজীব (সপ্রাণ) জপ হয়। অতএব নামী অর্থাৎ যাঁর জপ করা হচ্ছে, তাঁর প্রতি প্রেম থাকা চাই এবং 'এটি আমার প্রিয়তমের নাম' — এই ভাব রেখেই নাম জপ করা উচিত॥১২২॥

প্রশ্ন—ভগবানের নাম অনন্ত। তাহলে অন্তিম সময়ে যে কোনো নাম নিলেই কি কল্যাণ লাভ হবে ?

উত্তর—বৃত্তি ভগবানের প্রতি হলে কল্যাণ হবে। এটি ভগবানের নাম—এই রকম বৃত্তি হওয়া চাই। নামেতেও কল্যাণ করবার শক্তি আছে, কিন্তু আমাদের মনোবৃত্তিই হলো কারণ। যেমন, ঠান্ডা লাগলে গরম কাপড় জড়ানো হয়। তাতে আমাদের শরীরের উষ্ণতা কাপড়ে চলে আসে এবং ঠান্ডাকে দূর করে। অন্তিম কালে ভগবানের নাম এই জন্য শোনান হয় যে তাতে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য করাবার শক্তি আছে॥১২৩॥

প্রশ্ন—মৃত্যুপথযাত্রী তো সংসারের কথা চিন্তা করে। কিন্তু অন্য লোক

তাকে ভগবানের নাম শোনাতে থাকে। তাতে কি তার কল্যাণ হবে ?

উত্তর—ভগবান মানুষকে অন্তিম সময়তে কিছু ছাড় দিয়েছেন। তাই অন্তিমকালে ভগবানের নাম শোনালে সেখানে যমদূত আসবে না। দ্বিতীয় কথা, যে নাম শোনায় তার উদ্দেশ্য হলো কল্যাণ করা। তাই নাম শোনালে তার কল্যাণ হয়। তৃতীয় কথা নাম শুনে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির অন্তিম সময়ে যদি ভগবান স্মরণে আসে, তাহলে তার কল্যাণ হবে॥১২৪॥

প্রশ্ন—কেউ যদি ভগবানের নাম না শুনিয়ে টেপ চালিয়ে দেয়, তাহলে ?

উত্তর—তাতেও যে টেপ চালিয়েছে তার উদ্দেশ্য কাজ করবে॥১২৫॥

প্রশ্ন—কেউ ভগবানের নাম না শুনিয়ে মনে মনে নাম জপ করলে কী হবে ?

উত্তর—তার উদ্দেশ্য কাজ করবে॥১২৬॥

~~○~~

পরার্থ

প্রশ্ন—পরার্থের ভাব হতে বাধা কোথায় ?

উত্তর—ব্যক্তিগত স্বার্থ হলো বাধা। বাস্তবে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাব থাকলে স্বার্থ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সকলের হিতের ভাব থাকলে (ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করলে) ব্যক্তিগত স্বার্থও সিদ্ধ হয়। যাদের সকলের হিত করার ভাব থাকে তাদের পশুও সেবা করে থাকে ॥১২৭॥

প্রশ্ন—ভজন ধ্যান প্রভৃতি সাধনা সকলের হিতের জন্য করতে হবে—এই কথা যদি সত্য হয় তাহলে একথা মানতে হবে যে আজ পর্যন্ত কারও সাধনা সিদ্ধ হয়নি। কেননা এখনও পর্যন্ত সকলের হিত হয়নি ।

উত্তর—এতে সকলের হিতের তাৎপর্য নেই, প্রত্যুত এতে আছে নিজের স্বার্থ ত্যাগের তাৎপর্য। সকলের হিতের কথা তো দূরের কথা, একজন ব্যক্তি অন্য একজনেরও হিত (কল্যাণ) করতে পারে না। তবে নিজের স্বার্থত্যাগ করতে পারে। সকলের হিতের ভাব হলো সাধন, সাধ্য নয়॥১২৮॥

প্রশ্ন—নিজের হিতের কথা না ভেবে অন্যের হিতের কথা কেন

চিন্তা করব ?

উত্তর—আমাদের হিত হোক—এই স্বার্থবুদ্ধিই আমাদের হিতের বাধা। যতই অপরের হিতের জন্য চিন্তা করব ততই নিজেদের স্বার্থ দূর হবে। যতই আত্মস্বার্থ দূর হবে ততই আমাদের হিত হবে॥১২৯॥

প্রশ্ন—দুঃখী ব্যক্তিকে দেখে যদি দুঃখ হয় তাহলে তার সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে যাবে। তখন বন্ধন দূর হবে কী করে ?

উত্তর—এই সম্বন্ধ বন্ধনকারী নয়। দুঃখী ব্যক্তিকে দেখে যদি দুঃখ হয় তাহলে তাতে এইটিই প্রমাণিত হয় যে তার অধিকারের কোনো বস্তু আমাদের কাছে আছে। সেই বস্তু তাদের সেবায় লাগিয়ে দাও॥১৩০॥

~~০~~

পাপ-পুণ্য

প্রশ্ন—পাপ-পুণ্যরূপ কর্মের সঞ্চয় কোথায় হয়ে থাকে ?

উত্তর—অন্তঃকরণে হয়। যেমন, বিদ্যুৎ কতটা খরচ হয়েছে তা মীটার থেকে জানা যায়। যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময় বিদ্যুৎ খরচ করুক আর তা যতই লুকিয়ে করুক মীটারে তা অঙ্কিত হয়ে যাবেই। এই রকম পাপ-পুণ্য হিসেব করবার বিশেষ মীটার অন্তঃকরণে রয়েছে॥১৩১॥

প্রশ্ন—নিজেকে অথবা অন্যকে রক্ষা করবার জন্য কোনো খারাপ লোককে মারলে কি পাপ হয় ?

উত্তর—যদিও এই কাজ হলো ক্ষত্রিয়দের, তবু দেশে যখন অরাজকতার সৃষ্টি হয়, শাসক (রাজা) যখন আমাদের ডাক শোনেন না, আমরা ন্যায়পথে চললেও আমাদের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ হতে থাকে, এমন অবস্থায় চারটি বর্ণের মানুষই ক্ষাত্রধর্মের অধিকারী হয়ে যায় অর্থাৎ নারী, গরু,সম্পত্তি, প্রাণ প্রভৃতি রক্ষার জন্য চারটি বর্ণের লোকেরা অস্ত্র ধারণ করতে পারে।[১] কিন্তু উদ্দেশ্য কেবল নিজেকে এবং নারী প্রভৃতিকে রক্ষা

[১]গবার্থে ব্রাহ্মণার্থে বা বর্ণানাং বাহপি সঙ্করে।
গৃহ্লীয়াতাং বিপ্রবিশৌ শস্ত্রং ধর্মব্যপেক্ষয়া॥ (বোধায়নস্মৃতি ২।২।৮০)

করাই হতে হবে, অন্যকে হত্যা করা উদ্দেশ্য যেন না হয়। রক্ষা করতে গিয়ে যদি সেই দুষ্ট লোক মরেও যায় তাহলে তাতে পাপ হয় না। তার মৃত্যুতে পৃথিবীর ভাল হবে এবং তারও ভাল হবে। কেননা তাতে সে আবার নতুন পাপ করা থেকে বেঁচে যাবে। বাস্তবে হিংসা হয় ভাব থেকে, ক্রিয়া থেকে হয় না।

ডাক্তার অপারেশন করবার সময় রোগীর দেহের অংশ কেটে ফেলেন, সেনারা দেশের সীমান্তে শত্রুকে মেরে ফেলে। এগুলিকে হিংসা মনে করা হয় না। কেননা ডাক্তার এবং সৈনিকদের ভাব হলো লোকের কল্যাণ করা॥১৩২॥

প্রশ্ন—পুণ্যকর্ম করলে কী পাপ কেটে যায় ?

উত্তর—পাপ কর্ম হলো 'ফৌজদারী মামলার' মতো আর পুণ্য কর্ম হলো 'দেওয়ানী মামলার' মতো। দুটির বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন। পাপ এবং পুণ্যের আলাদা আলাদা হিসেব হয়। এজন্য স্বাভাবিক ভাবে এই দুটির একটি আর একটিকে কাটে না অর্থাৎ পাপের দ্বারা পুণ্য কাটে না এবং পুণ্যের দ্বারা পাপ কাটে না। কিন্তু মানুষ যদি পাপ কাটাবার উদ্দেশ্যে প্রায়শ্চিত্য করে তাহলে তাতে পাপ কাটতে পারে। যেমন জরিমানা দিয়ে মানুষ জেল থেকে বাঁচতে পারে।।১৩৩॥

প্রশ্ন—যখন পাপ-পুণ্য একে আর একটিকে কাটে না তাহলে ঋষিদের তপস্যা কি করে ভঙ্গ হতো ?

উত্তর—তপস্যা ভঙ্গ হয় না, তাতে বাধা উপস্থিত হয়। যত তপস্যা হয়ে গিয়েছে সেগুলি নষ্ট হয় না, নিজে বিচলিত হলেই তপস্যায় বাধা আসে। নিজে যদি বিচলিত না হন তাহলে তাঁকে কেউ বিচলিত করতে পারে না **'কামী বচন সতী মনু জৈসেঁ'** (শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ২৫১।৭)॥১৩৪॥

প্রশ্ন—বর্তমানে বড় পাপ এবং বড় পুণ্যের ফল তখনই দেখা যায় না, এর কী কারণ ?

উত্তর—এর কারণ কলিযুগ। কেননা কলিযুগ হলো অধর্মের মিত্র— **'কলিনাধর্মমিত্রেণ'** (পদ্মপুরাণ, উত্তর. ১৯৩।৩১)। হ্যাঁ, জমা হতে হতে পরে তার ভয়ঙ্কর ফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। যেমন, ফোড়া ধীরে ধীরে বাড়ে এবং পেকে গিয়ে ফেটে যায়॥১৩৫॥

প্রশ্ন—কোনো কোনো লোকের কৃত পাপের ফল সমগ্র সমাজকে কেন ভোগ করতে হয় ?

উত্তর—সৃষ্টি হলো একটি একক (ইউনিট)। তাই ব্যক্তির পাপ বা পুণ্যের প্রভাব সমগ্র সৃষ্টিতে পড়ে। কিন্তু তার ফলভোগে ভিন্নতা থাকবেই অর্থাৎ পাপাত্মার উপর যতটা ঝামেলা আসবে, তেমন ঝামেলা পুণাত্মাদের উপর আসবে না। পুণ্যাত্মা পুরুষেরাও আগে করা নিজেদের পাপের ফল ভোগেন। কখনও কখনও ঝামেলা এলে তাঁরা বেঁচেও যান। যেমন, দুর্ঘটনা হলে একই গাড়ীর আরোহীদের মধ্যে কেউ বেঁচে যায় আবার কেউ মারা যায়॥১৩৬॥

~~o~~

প্রার্থনা

প্রশ্ন—প্রার্থনায় মূল কথা কী ?

উত্তর—নিজের বলহীনতা এবং ভগবানের সবলতাকে (প্রভাব, সামর্থ্য) উপলব্ধি করা॥১৩৭॥

প্রশ্ন—প্রার্থনা না করলে কি ভগবান রক্ষা করেন না ?

উত্তর—রক্ষা এবং পালন করবার শক্তির নামই হলো পরমাত্মা। এজন্য প্রার্থনা না করলেও তিনি সকলকে রক্ষা করেন। যেমন সকলের প্রতি ভগবানের কৃপা হয় তবু যারা সেই কৃপাকে স্বীকার করে তাদের উপর কৃপা বেশি করে ফলদায়ক হয়। তেমনই যারা দ্রৌপদী, গজরাজ প্রভৃতির মতো আর্তভাবে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করে ভগবৎ কৃপা তাদের উপর বেশি করে ফলদায়ক হয়॥১৩৮॥

প্রশ্ন—কখনও কখনও প্রার্থনা করলেও ভগবান কষ্ট থেকে রক্ষা করেন না। এর কী কারণ ?

উত্তর—আর্তির মধ্যে ভাবের ঘাটতি থাকলে প্রার্থনা সফল হয় না। এজন্য আর্তভাবে এবং নিজেকে অক্ষম মনে করে প্রার্থনা করা উচিত—**'নিরবল হ্বে বলরাম পুকার্য়ো আয়ে আধে নাম'**॥১৩৯॥

প্রশ্ন—প্রার্থনা করা সত্ত্বেও রক্ষা না হওয়ায় কোনো কোনো মানুষের

মধ্যে নাস্তিকতা এসে যায়। এমন কেন হয় ?

উত্তর—আগে থেকেই অন্তরে নাস্তিকতা থাকে, তাই তা আসে। যে আগে থেকেই নাস্তিক ছিল, সেই নাস্তিক হয়। যে আস্তিক সে প্রচন্ড প্রতিকূল পরিস্থিতি এলেও আস্তিকই থাকে। ভগবান যত বিরুদ্ধ পরিস্থিতিই পাঠান না কেন ভক্তের মধ্যে নাস্তিকতা আসে না। কেননা সে সকল পরিস্থিতিতেই ভগবানের কৃপা প্রত্যক্ষ করে॥১৪০॥

প্রশ্ন—অন্যের দুঃখ দূর করবার জন্য কি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা যায় ?

উত্তর—করতে পারেন। তাতে কোনো দোষ নেই। কেবল একটি দোষই আসে যে আমরা কি বেশি দয়ালু ? ভগবানের মধ্যে কি দয়া নেই ? ॥১৪১॥

~~○~~

প্রাণ

প্রশ্ন—প্রাণশক্তি এবং চেতনাশক্তি কী ?

উত্তর—প্রাণশক্তি ক্রিয়াত্মক হওয়ায় তা হলো 'রাজসী' আর চেতনাশক্তি বিবেকাত্মক হওয়ায় তা হলো 'সাত্ত্বিকী'। শরীরের নড়াচড়া প্রাণশক্তির দ্বারা হয়। টিকটিকির ল্যাজ কাটলেও প্রাণশক্তির কারণে তা নড়তে থাকে আর প্রাণ-শক্তি ধীরে ধীরে সমষ্টি প্রাণে লীন হয়ে যায়। চেতনাশক্তি হলো অন্তঃকরণের বৃত্তি। একজন লোক নিদ্রিত আর একজন লোক মৃত। প্রাণশক্তি না থাকায় দুজনের শরীর অচল। কিন্তু দুজনের মুখ দেখলে তাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। এই পার্থক্য নিদ্রিত ব্যক্তির চেতনাশক্তির কারণেই দেখা যায়॥১৪২॥

প্রশ্ন—মারা গেলে প্রাণ (সূক্ষ্ম শরীর) বেরিয়ে যায়। তাহলে টিকটিকির কাটা লেজ নড়ে কেন ?

উত্তর—তাতে প্রাণের ক্রিয়া থাকে বলেই তা নড়ে। প্রাণ ধীরে ধীরে দেহত্যাগ করে যায়। এজন্য কারও মৃত্যুর পরই তার অগ্নি সংস্কার না করে প্রায় আট ঘন্টা ভগবৎ নাম কীর্তন করা উচিত।

প্রাণ (বায়ু) ছাড়া কোনো ক্রিয়া হতেই পারে না। শরীরের সকল কাজ

প্রাণের দ্বারাই হয়। প্রাণ থেকেই গমনা-গমন হয়। বলও বায়ুর থেকে হয়ে থাকে। বায়ুপুত্র হওয়ার ফলে হনুমান এবং ভীম খুব বলবান ছিলেন। কোনো ভারী জিনিস ওঠাবার সময় শ্বাস (বায়ু) বন্ধ করে ওঠাতে হয়। শ্বাস নিতে নিতে ভারী জিনিস ওঠান যায় না॥১৪৩॥

~~○~~

ভাগ্য (প্রারব্ধ)

প্রশ্ন—মানুষের অদৃষ্টে (জন্ম-কুণ্ডলীতে) যা লেখা আছে তাই তো হয়। তাহলে মানুষ কাজ করায় স্বাধীন কেমন করে হবে ?

উত্তর—একটি 'করার' বিষয় এবং অন্যটি 'হওয়ার' বিষয়। নিয়তিতে 'হওয়ার' কথা লেখা আছে, 'করার' কথা লেখা নেই। পারমার্থিক উন্নতির কথা নিয়তিতে না থাকলেও মানুষ পারমার্থিক উন্নতি করতে পারে। কাজ করায় মানুষ স্বাধীন। যদি ভাগ্য অনুসারেই সব কিছু হোত তাহলে গুরু, সৎসঙ্গ, শিক্ষা প্রভৃতি সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যেত॥১৪৪॥

প্রশ্ন—কোষ্ঠীতে শিশু দুরাচারী হবে, না সদাচারী হবে তার ইঙ্গিত থাকে। তাহলে মানুষ কি কর্মের অধীন হলো ?

উত্তর—জন্মাবার সময় ভাগ্য অনুসারে যেমন গ্রহ-নক্ষত্র হয় সেই রকমই লিখে দেওয়া হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে মানুষ কেমন হবে তা তার ইচ্ছাধীন।

গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতির প্রভাবের একটি সীমা আছে। মানুষের অন্তঃকরণে গ্রহগুলির প্রভাবে কখন কখন ভাল অথবা মন্দ বৃত্তি সৃষ্টি হতে পারে, তবে তাদের প্রভাবে কর্ম সম্পাদনে মানুষ পরাধীন নয়। সে চাইলে নিজের বিবেককে ব্যবহার করে নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করতে পারে। যেমন, ভাগ্য অনুসারে আমাদের ধন লাভ আছে। যথাসময়ে তা আমরা পেয়ে যাব। কিন্তু সেই ধন গ্রহণ করায় অথবা না করায় এবং সেই লব্ধ ধনের সদ্ব্যবহার বা অপচয় করার বিষয়ে আমরা স্বাধীন।।১৪৫॥

প্রশ্ন—ভৃগু-সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে এই মানুষটি অমুক অমুক কর্ম করবে। তাহলে মানুষ কর্ম সম্পাদনে কী করে স্বাধীন হল ?

উত্তর—জ্যোতিষে কর্মের কথা ততটাই আসে যাতে ফলভোগ হতে পারে। যথা, ব্যবসায়ে লাভ বা ক্ষতি হওয়ার থাকলে মানুষ এমন কাজ করতে থাকবে যাতে ফলভোগ (লাভ বা লোকসান) হতে পারে। সকল ক্রিয়া ঠিকুজি (ভাগ্য) অনুসারে হতেই পারে না। মানুষ মাত্রই একদিনে এত কাজ করে যা লিখলে একটি বই হয়ে যাবে॥১৪৬॥

প্রশ্ন—ফল ভোগ করবার জন্য ভাগ্য যে কর্ম করায় তা ভাগ্যানুসারে, নাকি ক্রিয়মান থেকে হচ্ছে—একথা কেমন করে বোঝা যাবে?

উত্তর—এটি নির্ণয় করা, বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন। তবে এই বিষয়ে এটি বোঝার যে, ফলভোগের জন্য ভাগ্য যে কাজ করায় তা শাস্ত্র নিষিদ্ধ নয়। শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাজ ভাগ্যের দ্বারা হয় না, তা হয় কামনা থেকে— **'কাম এষঃ'** (গীতা ৩।৩৭)। অতএব ভাগ্যানুসারে কর্ম করার মনোবৃত্তি তো হয়ে যাবে, কিন্তু নিষিদ্ধ আচরণ হবে না। কেননা ফল ভোগের জন্য নিষিদ্ধ আচরণের প্রয়োজন নেই। নিষিদ্ধ আচরণ হল নতুন কর্ম॥১৪৭॥

প্রশ্ন—বাল্মিকী প্রথমেই রামায়ণ লিখেছিলেন এবং তারপর সেই অনুসারে ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয়েছিল। তাহলে মানুষ কী করে স্বাধীন হলো?

উত্তর—ভগবানের কথা অদ্ভুত, কেননা তিনি কর্মের অধীন নন। তাঁর লীলায় সহায়ক অন্যান্য পাত্রও (মন্থরা, কৈকেয়ী প্রভৃতি) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁরা সাধারণ নয়। রামায়ণে কেবল প্রধান প্রধান বিষয় লেখা হয়েছে। ভগবান রাম তথা অন্য পাত্রদের প্রতিদিন অনেক কাজ করতে হোত। কিন্তু সেই সব কাজের কথা রামায়ণে কোথায় লেখা আছে? ॥১৪৮॥

প্রশ্ন—মানুষের যত কিছু প্রয়োজন ততটুকু বস্তুই কি সে পায়, নাকি বেশিও পেয়ে থাকে?

উত্তর—সব সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু পাওয়া যায়। মানব-জীবনের সময় এত বেশি পাওয়া গিয়েছে যে মানুষ নিজের কল্যাণ অনেক বার করতে পারে।[১] বীর্যে লক্ষ লক্ষ শুক্রাণু থাকে, কিন্তু জীব একটি শুক্রাণু থেকেই সৃষ্টি

---

[১]বাস্তবে কল্যাণ, মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞান, ভগবৎপ্রাপ্তি একবারই হয়ে থাকে এবং তা হয় চিরকালের জন্য—**'যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহম্‌'** (গীতা ৪।৩৫)

হয়। সংসারেও দেখা যায় যে মোটর গাড়ীতে চার-পাঁচ জন লোকের বসবার জায়গা তৈরী করা হয়, কিন্তু আটজন-নয়জন লোকও বসে যায়। প্রয়োজনানুসারে বস্তু কাজে লাগানো হয়, কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু সংগ্রহ করা হয়॥১৪৯॥

প্রশ্ন—শাস্ত্রে আছে যে পিতার কৃত কর্মের ফল পুত্র-পৌত্রাদিদের ভোগ করতে হয়। এমনও দেখা যায় যে পিতার কোনো ব্যাধি থাকলে তা পুত্র-পৌত্রাদির মধ্যেও এসে যায়। কেন এমন হয় ?

উত্তর—যেমন বেতার কেন্দ্র থেকে ধ্বনির প্রসারণ হয় এবং বেতার যন্ত্রের চাবি ঘোরালে সেই নম্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় অর্থাৎ তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়, তাতে ঐ ধ্বনি ধরা যায়। তেমনই জীব তারই কাছে জন্মগ্রহণ করে যার সঙ্গে তার কোনো কর্ম-সম্বন্ধ (ঋণানুবন্ধ) থাকে। অতএব পুত্র-পৌত্র একরকম নিজেদের কর্মভোগই করে অর্থাৎ তাদের বংশ পরম্পরায় সেই ব্যাধিই জোটে, যার ভোগ তাদের ভাগ্যে লেখা আছে॥১৫০॥

প্রশ্ন—যখন ভাগ্যানুসারেই ধন লাভ হয় তাহলে উদ্যোগ কেন করব ?

উত্তর—উদ্যোগ করা আমাদের কর্তব্য— এইরকম মনে করেই করা উচিত। মানুষের নিজেদের কর্তব্য পালন করা উচিত। ভগবানের আদেশও আছে— '**কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন**' (গীতা ২।৪৭) 'তোমার অধিকার কেবল কর্তব্য করাতে, ফলেতে নয়'। মানুষ যদি কর্তব্য কর্ম না করে তাহলে তার শাস্তি হবে। কর্তব্য কর্ম করলে তখনই শান্তি লাভ হবে আর না করলে তখনই অশান্তি ॥১৫১॥

প্রশ্ন—ধন লাভ তো ভাগ্যানুসারে হবে, কিন্তু সেই ধন খরচ করা কি নতুন কর্ম, নাকি ভাগ্য ?

উত্তর—ধন খরচ করা, কৃপণ হওয়া অথবা উদার হওয়া নতুন কর্ম, ভাগ্য নয়॥১৫২॥

প্রশ্ন—ভাগ্য অনুসারে যখন দুঃখ ভোগ করতেই হয় তাহলে ওষুধ, দান, মন্ত্র, অনুষ্ঠান প্রভৃতির উপযোগিতা কী ?

উত্তর—যেমন কোনো বন্দীর যদি জেল হয় তাহলে সে জরিমানা দিয়ে কারাবাসের মেয়াদ কমিয়ে নিতে পারে, তেমনই মানুষ ওষুধ, মন্ত্র প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা ভাগ্যের ভোগান্তিকে হ্রাস করতে পারে॥১৫৩॥

প্রশ্ন—ভগবৎ কৃপায় কি ভাগ্যের বিনাশ হতে পারে ?

উত্তর—হ্যাঁ, হতে পারে। এজন্য আর্তভাবে প্রার্থনা করলে পরিস্থিতি বদলে কষ্ট দূর হয়ে যায়॥১৫৪॥

প্রশ্ন—আহার করলে ক্ষুধা দূর হয়, এটি হলো ফল। শৌচ[১] করা, এটি হলো 'কর্মের ফলেরই কর্ম'। অতএব মানুষ যা কিছু করে সবই ভাগ্যানুসারে করে। পুরুষার্থের দ্বারা কিছু হয় না, সব ভাগ্যের দ্বারা হয়। এটি কি ঠিক ?

উত্তর—কর্মের ফল কখনও কর্ম হয় না। পক্ষান্তরে তা হয় ভোগ। শৌচ করা কর্ম নয়, কেননা এতে কর্তৃত্ব নেই। ক্রিয়মান কর্মের ফল-অংশের দুটি ভাগ— দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট। এগুলির মধ্যে দৃষ্টেরও দুটি অংশ— তাৎকালিক এবং কালান্তরিক। আহার করবার সময় তৃপ্তি লাভ হলো 'তাৎকালিক ফল' আর পরিণামে শৌচ করা হলো 'কালান্তরিক ফল'।

ভাগ্যের ফল হলো ভোগ, কর্ম নয়। যদি কর্মের ফলও কর্ম হয় তাহলে কর্মের অবসান কখনও হবে না। কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি হবে না— এটি হলো'অনবস্থা দোষ'। পুরুষার্থের দ্বারা ভাগ্য গঠিত হয়, কিন্তু পুরুষার্থ ভাগ্যের দ্বারা গঠিত হয় না। যদি সব কাজই ভাগ্যানুসারে হবে তাহলে ভাগ্য হবে কোথা থেকে ? ভাগ্য হলো ক্রিয়মান কর্মের অংশ, তা ক্রিয়মান কর্ম কি করে করবে ? যারা মনে করে যে সকল কর্ম ভাগ্য অনুসারেই হয় তাদের জন্য এই একটি প্রশ্নই যথেষ্ট, 'ত্যাগ' কী কাজে আসবে, কোথায় কাজে আসবে ?

পুরুষার্থ ছেড়ে দিলে যে কাজ হয় তা ভগবানের কৃপাতে হয়ে থাকে। তাকে ভাগ্য মনে করা ভুল। নিজের পুরুষার্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা হলো শরণাগতি। শরণাগতের কাজ ভগবানের কৃপায় হয়ে থাকে॥১৫৫॥

প্রশ্ন—যে জিনিস ভাগ্যে নেই, ত্যাগ করলে সেই জিনিস কী করে পাওয়া যায় ?

---

[১]শাস্ত্রানুসারে অন্তর ও দেহের শোধন।

উত্তর—অনুরাগ ত্যাগ করলে কোনো জিনিসের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। কোনও বস্তুরই সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে প্রয়োজনীয় বস্তু স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যায়। পুণ্যকর্মের দ্বারা যে ভাগ্য গঠিত হয় তার চেয়েও বড় ভাগ্য গঠিত হয় ত্যাগের দ্বারা॥১৫৬॥

প্রশ্ন—শত শত লোক যখন এক সঙ্গে মারা যায় তখন সকলের ভাগ্য একই রকম কী করে হয় ?

উত্তর—যারা এক সঙ্গে পাপ করেছে তারা এক সঙ্গে মারা যায়। যেমন, লোকসভায় গোহত্যা প্রভৃতির অনুমোদনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে সমর্থকরা যদি কোনো জন্মে মারা যায় তাহলে এক সঙ্গেই মারা যাবে। সম্মতি যত বেশি হবে তত বেশি কষ্ট হবে। মৃদু সম্মতি থাকলে আহত হবে মাত্র ॥১৫৭॥

প্রশ্ন—ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না। তাহলে মানুষ কর্ম সম্পাদনে স্বাধীন কী করে বলা যায় ?

উত্তর—'হওয়া'-র একটি পর্ব আর 'করা'-র একটি পর্ব। ভগবানের কৃপা ছাড়া পাতা নড়ে না, কিন্তু নাড়ান যায়। বলা হয়েছে নড়ে, নড়ান যায় না—একথা বলা হয়নি। আমরা ব্যবসা, কৃষি প্রভৃতি 'করি' এবং লাভ-ক্ষতি প্রভৃতি 'হয়'। তাৎপর্য হলো 'করা' আমাদের হাতে আর 'হওয়া' ভগবানের অথবা ভাগ্যের হাতে॥১৫৮॥

~~○~~

প্রেম

প্রশ্ন—জীবের তো ভগবানের প্রতি আকর্ষণ (প্রেম) থাকে কিন্তু জীবের প্রতি ভগবানের আকর্ষণ কেমন ?

উত্তর—আকর্ষণ ভগবান এবং জীব উভয়ের মধ্যেই আছে । কিন্তু ভুল আছে জীবের মধ্যে, ভগবানে নেই। যেমন শিশু মায়ের প্রেমকে দেখতে পায় না তেমনই সংসারের প্রতি আকর্ষণ থাকার কারণে মানুষ ভগবানের প্রেমকে (আকর্ষণ) দেখতে পায় না। যদি ভগবানের প্রেম দেখতে পায় (চিনতে পারে)

তাহলে সংসারের প্রতি তার আকর্ষণ ঘুচে যায়।

ভগবান বলেন—**'সব মম প্রিয় সব মম উপজায়ে'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৮৬।২)। ভগবানের প্রেমই জীবকে আকর্ষণ করে, তার ফলে কোনো পরিস্থিতি চিরকাল থাকে না॥ ১৫৯॥

প্রশ্ন—পরম প্রেমকে লাভ করবার আগে কি মুক্ত হওয়া প্রয়োজন ?

উত্তর—জ্ঞানমার্গে মুক্তির পর প্রেম লাভ হয় আর ভক্তিমার্গে প্রেম-লাভের পর মুক্তি হয়।

প্রেম তো প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে স্বভাবতঃই বিদ্যমান। কিন্তু সংসারের প্রতি অনুরাগ থাকার কারণে সেই প্রেম প্রকট হয় না। সৎসঙ্গের দ্বারা যতটা বিষয়ানুরাগ দূর হয় ততটাই প্রেম প্রকট হয় এবং যত প্রেম প্রকট হয় ততই সংসারানুরাগ দূর হয়।

বাস্তবে মহাপুরুষই প্রেমের অধিকারী। মুক্তির আগেও প্রেম হতে পারে, কিন্তু তা আসল নয়। তবে সাধকদের পক্ষে তা খুব সহায়ক। প্রকৃত প্রেম মুক্তির পরে হয়। মুক্তির আগে 'আমি ভগবানের' এই রকম বোধ থাকে। কিন্তু মুক্তির পরে বোধ নয়, অনুভূতি থাকে॥ ১৬০॥

প্রশ্ন—ভগবান প্রেমলীলার জন্য নারী ও পুরুষের (রাধা-কৃষ্ণ) রূপ কেন ধারণ করেছিলেন ? দুজন বন্ধুর মধ্যেও তো প্রেম হতে পারে।

উত্তর—সংসারে নারী-পুরুষ পরস্পরের মধ্যে সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ থাকে। সেজন্য আকর্ষণ নারী-পুরুষের মতো হোক, কিন্তু তাতে নিজের সুখবুদ্ধি বিন্দুমাত্র যেন না থাকে— এই কথা সংসারের মানুষদের বোঝাবার জন্যই ভগবান রাধা ও কৃষ্ণের রূপ ধারণ করেছিলেন। যার দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের ভেদ আছে সে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম লীলাকে বুঝতে পারে না। এটিকে ঠিকভাবে বোঝবার জন্য সাধকদের উচিত তাঁরা যেন নারী-পুরুষের ভাব না রাখেন। নিজেদের মধ্যে সুখবুদ্ধি থাকার কারণে এই ভাব বুঝতে কঠিন লাগে। যার মধ্যে বিন্দুমাত্রও নিজের সুখের প্রতি আসক্তি আছে সে প্রেমতত্ত্বকে বুঝতে পারে না। এজন্য এই ভাবকে জীবন্মুক্তরাই ঠিকভাবে বুঝতে পারেন॥ ১৬১॥

প্রশ্ন—শ্রীজীর (রাধিকার) অনুরাগপূর্ণ ভক্তি কি জীবেরা পেতে পারে?

উত্তর—হ্যাঁ, পেতে পারে। কেননা ভগবান শ্রীজীকেও নিজের মধ্যে থেকে সৃষ্টি করেছেন, জীবেদেরও করেছেন। তাই শ্রীজী এবং জীবের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। প্রভেদ হলো জীব লব্ধ স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে, কিন্তু শ্রীজী তা করেননি। শ্রীজীর অনুরাগপূর্ণ ভক্তি (প্রেম) সকল জীব লাভ করতে পারে॥১৬২॥

প্রশ্ন—প্রেমে এক হতে দুই হয়ে গেলে দুজনেরই অবস্থান সমান থাকে। তাহলে দাস্যভাব (একজন প্রভু অন্যজন সেবক) কী করে হয় ?

উত্তর—দাস্য প্রভৃতি যেমন ভাবই হোক প্রেমের ক্ষেত্রে নিজের পৃথক সত্তা থাকে না, কেননা প্রেমে একই দুই হয়েছে। এজন্য কখনও সেবক প্রভু হয়ে যায়, কখনও প্রভু সেবক হয়ে যায়। কখনও রাধা কৃষ্ণ হয়ে যান, কখন কৃষ্ণ রাধা হয়ে যান। শঙ্করের সম্পর্কেও বলা হয়েছে— **'সেবক স্বামি সখা সিয় পী কে'** (শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ১৫।২)। দক্ষিণের একটি মন্দিরে শঙ্কর নন্দীকে তুলে রেখেছেন। কখনও নন্দী শঙ্করকে উপরে ওঠায়, কখনও শঙ্কর নন্দীকে উপরে ওঠান। কখনও ভগবান কৃষ্ণ ইষ্ট, কখনও অর্জুন ইষ্ট— **'ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি'** (গীতা ১৮।৬৪)। এজন্য প্রেমকে প্রতি মুহূর্তে বর্ধমান বলা হয়েছে॥১৬৩॥

প্রশ্ন—যখন সাধক ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান তখন তিনি প্রেম লাভ করেন, কিন্তু যিনি সিদ্ধ (জীবন্মুক্ত) তিনি কি করে প্রেম লাভ করবেন ?

উত্তর—সাধকের থাকে একাত্মতা আর যে মুক্ত তার থাকে অতৃপ্তি। তাৎপর্য হলো যখন ভগবানের কৃপা মুক্তির রসকেও জলো করে দেয় তখন তাদের এই অতৃপ্তি জাগে যে 'নিজ'কে (স্বয়ং) পেয়েছি, কিন্তু 'নিজস্বতা' (স্বকীয়তা) তো পাইনি। মুক্তির প্রতি অতৃপ্তি থাকলে তিনি পরম প্রেম লাভ করেন॥১৬৪॥

প্রশ্ন—ভগবানকে কীকরে মিষ্টি মনে হবে ?

উত্তর—সংসারকে বিস্বাদ মনে হলে ভগবানকে মিষ্টি মনে হবে।।১৬৫॥

প্রশ্ন—মুক্তিতে তো সূক্ষ্ম অহঙ্কার থাকে, কিন্তু প্রেমে তা থাকে না, এর কারণ কী ?

উত্তর—কারণ হলো এই যে, জীব পরমাত্মার অংশ। তাই সে পরমাত্মা থেকে যতই দূরে যায় ততই অহঙ্কার দৃঢ় হতে থাকে। আর যতই পরমাত্মার দিকে যায় ততই অহঙ্কার দূর হতে থাকে। এজন্য স্বরূপে স্থিত হওয়ার পরেও সূক্ষ্ম অহঙ্কার থেকে যায় এবং প্রেমে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ার পর অহঙ্কার সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়॥ ১৬৬॥

প্রশ্ন—ভগবানের প্রতি প্রেম কী করে বর্ধিত হবে ?

উত্তর—আমরা কেবল ভগবানেরই অংশ। তাই তিনি আমাদেরই। তিনি ছাড়া আর কেউ আপন নন। এইভাবে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা এলে নিজে থেকেই প্রেম বর্ধিত হবে। তাছাড়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিত 'হে নাথ ! আপনাকে যেন মিষ্টি লাগে, আপনি যেন প্রিয় হন।' ভগবানের গুণগান করলে তাঁর প্রতি ভালবাসা জন্মায়। ভগবানের চরিত্র পাঠের চেয়ে ভক্ত-চরিত পড়ার মাহাত্ম্য বেশি॥ ১৬৭॥

প্রশ্ন—প্রেম প্রতিক্ষণে কীকরে বর্ধমান হয় ?

উত্তর—প্রেমে যোগ এবং বিয়োগ, মিলন এবং বিরহ দুটিই থাকে। যখন ভক্তের বৃত্তি ভগবানের দিকে যায় তখন 'নিত্যযোগ' হয়, আর যখন নিজের দিকে যায় তখন 'নিত্যবিয়োগ' হয়। ভগবানের দিকে বৃত্তি গেলে ভগবান ছাড়া আর কিছু দৃষ্ট হয় না আর নিজের দিকে বৃত্তি গেলে নিজেকে আলাদা মনে হয়। 'কেবল ভগবানই আছেন' এটি হলো নিত্যযোগ আর 'আমি ভগবানের' এটি হলো নিত্যবিয়োগ। নিত্যযোগে প্রেমের স্বাদ পাওয়া যায় আর নিত্যবিয়োগে প্রেম বৃদ্ধি হয়॥ ১৬৮॥

প্রশ্ন—যদি আমরা নিষ্কামভাবে কোনো ব্যক্তিকে ভালবাসি তাহলে তার কী পরিণাম হবে ?

উত্তর—কামনা থাকার ফলেই সংসার সংসাররূপে দৃষ্ট হয়। কামনা না থাকলে সব কিছুই পরমাত্মা, সংসারের অস্তিত্বই নেই। নিষ্কাম ভালবাসা হলে সংসার থাকবে না। কামনা চলে গেলে সংসারও চলে গেল। তাই নিষ্কামভাবে যে কোনো একজনকে ভালোবাসলেই তা ভগবানের প্রতি উদ্দীষ্ট হয়ে যাবে॥ ১৬৯॥

প্রশ্ন—ভগবানের মধ্যে প্রেমের ক্ষুধা থাকে কেন ?

উত্তর—ভগবানের মধ্যে রয়েছে অপার প্রেম। এজন্য তাঁর মধ্যে প্রেমের ক্ষুধা আছে। যেমন, যার কাছে যত বেশি ধন আছে তার তত বেশি ধনের ক্ষুধা থাকে। ভগবানের মধ্যে প্রেম কম নেই। কিন্তু ক্ষুধা আছে॥১৭০॥

প্রশ্ন—প্রেমে রোদন করা এবং মোহবশত (শোকে) রোদন করা—এই দুটির মধ্যে কী পার্থক্য ?

উত্তর—প্রেমের অশ্রু শীতল আর মোহের অশ্রু উষ্ণ। মোহের অশ্রু চোখের মধ্যখান থেকে বর্হিগত হয় আর প্রেমের অশ্রু চোখের ভিতরের (নাকের দিকের) কোণ থেকে নির্গত হয়। প্রেম অধিক হলে অশ্রু পিচকারীর মতো বেগের সঙ্গে নির্গত হতে থাকে ॥১৭১॥

~~○~~

ভক্ত

প্রশ্ন—মানুষ কখন ভক্ত হয় ?

উত্তর—নিজের অসহয়তার অনুভূতি এবং ভগবানের মহান প্রভাবের প্রতি বিশ্বাস হলেই মানুষ ভক্ত হতে পারে। কেননা দুর্বলের বলবানের সঙ্গে, ক্ষুধার্তের অন্নের সঙ্গে, তৃষ্ণার্তের জলের সঙ্গে, রোগীর বৈদ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে থাকে।

ভগবান সর্বজ্ঞ, পরম সুহৃদ এবং সর্বশক্তিমান— সবই হলো ভগবানের প্রভাব। নিজের মধ্যে কিছু ক্ষমতা, যোগ্যতা, বিশেষত্ব দেখলে এবং অসহয়তার জন্য দুঃখ না হলে অর্থাৎ তা দূর করবার প্রয়োজন অনুভূত না হলে ভগবানের প্রভাবের উপর বিশ্বাস হয় না॥১৭২॥

প্রশ্ন—প্রেমী ভক্তের কি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় ?

উত্তর—প্রেমী ভক্তের জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। কেননা প্রেমে শুধু নির্ভেজাল জ্ঞান থাকে। এক প্রেমাস্পদ (পরমাত্মা) ছাড়া আর কিছুই নেই—প্রকৃত জ্ঞান এইটিই॥১৭৩॥

প্রশ্ন—একই ভগবান প্রতিক্ষণে বর্ধমান প্রেমের লীলার জন্য কৃষ্ণ এবং

শ্রীজী (রাধা) দুটি রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তাহলে অন্য প্রেমী ভক্তের স্থান কোথায় হয় ?

উত্তর—অন্য প্রেমী ভক্ত শ্রীজীতে লীন হয়ে যান॥১৭৪॥

প্রশ্ন—ভগবান তাঁর ভক্তের ঋণকে কী ভাবে ক্ষমা করেন ?

উত্তর—শরণাগত ভক্তের নিজের বলে কিছুই নেই। যা কিছু আছে তা ভগবানের। অতএব ভক্তের ঋণ ভগবানের উপর এসে যায়। যেমন কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার সম্পত্তি সরকারের অধিকারে চলে যায়।

সংসারে কোনো কিছুকে নিজের মনে করলে ঋণ হয়ে যায়। যে কোনো কিছুকেই নিজস্ব বলে মনে করে না এবং কিছু চায়ও না তার ঋণ কী করে হবে ? ॥১৭৫॥

প্রশ্ন—ভক্ত নিজের সুখ যত্ন না করে ভগবানকে কী করে সুখ দেয় ?

উত্তর—ভক্ত ভগবানের **'একাকী ন রমতে'**— এই অভাব পূরণ করেন। তার কারণ ভগবান সংসারকে ভক্তের জন্য সৃষ্টি করেছেন আর ভক্তকে নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এজন্য সেই ভগবানের সুখের জন্যই ভক্তের অস্তিত্ব। বাস্তবে সুখের ভোক্তা ভগবান, জীব নয়। যেমন শিশু মায়ের জন্য, তেমনই ভক্তও ভগবানের জন্য। ভগবান ছাড়া ভক্তের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই॥১৭৬॥

প্রশ্ন—ভক্ত কি সমগ্র সংসারের কল্যাণ করতে পারেন ? যদি পারেন তাহলে তা করছেন না কেন ?

উত্তর—ভক্ত চাইলে সমগ্র সংসারের উদ্ধার করতে পারেন। অন্যের কল্যাণ করবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে সামর্থ্যের অহঙ্কার থাকে না। তাঁর এই ভাব থাকে যে, ভগবান থাকতে আমি কী কল্যাণ করব ? ভক্তের অন্তরে এমন ভাব নেই যে তিনি কল্যাণ করতে পারেন। তাঁর দৃষ্টিতে এক ভগবান ছাড়া আর কেউ নেই— **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**, তাহলে তিনি কার কল্যাণ করবেন ? ॥১৭৭॥

প্রশ্ন—শ্রীমৎ ভাগবতে ভগবান বলেছেন যে 'আমি ভক্তদের পিছনে এই ভেবে ঘুরি যে তার চরণধূলি আমার উপর পড়ুক এবং আমি পবিত্র হয়ে

যাই।'[১] এই পবিত্র হওয়াটা কী ?

উত্তর—পাপী-পুণ্যাত্মা, পবিত্র-অপবিত্র সব কিছুই ভগবানের অন্তর্ভুক্ত। সকল পাপী ভগবানের মধ্যেই থাকে তাই তাদের অপবিত্রতা ভগবানেরই অপবিত্রতা এবং তাদের শুদ্ধি ভগবানেরই শুদ্ধি। তাৎপর্য হলো ভক্তের চরণধূলায় (ভগবানের মধ্যে অবস্থানকারী) পাপীও পবিত্র হয়ে যায়॥১৭৮॥

প্রশ্ন—ভক্তের সাধন এবং সাধ্য দুটিই হলো ভগবান। ভগবান সাধন কেমন করে হলেন ?

উত্তর—তার দ্বারা যে সাধনা হয় তাতে সে ভগবানের কৃপাকে হেতু বলে মানে। তার সাধনায় ভগবানেরই আশ্রয় থাকে। সে সাধননিষ্ঠ না হয়ে ভগবন্নিষ্ঠ হয়॥১৭৯॥

প্রশ্ন—ভক্ত এবং ভগবানের চরিত্রে কী প্রভেদ ?

উত্তর—দুজনের চরিত্র একই রকম। পার্থক্য এইটুকুই যে ভক্তের মধ্যে প্রথমে জড়তা ছিল, কিন্তু ভগবানে কখনই জড়তা আসেনি। দুজনের চরিত্র শ্রবণে কল্যাণ হয়। ভগবানের চরিত্র শ্রবণে ভক্ত অধিকারী এবং ভক্তের চরিত্র শ্রবণে অধিকারী হলেন ভগবান॥১৮০॥

প্রশ্ন—ভক্ত-চরিত্রে উল্লিখিত কোনো কোনো ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সংশয় জাগলে কী করা উচিত ?

উত্তর—সংশয় জাগলে এই চিন্তা করতে হবে যে ঘটনা যদি মিথ্যাও হয় তাহলেও এমন ঘটনা তো ঘটতে পারে। সিদ্ধান্তের দিক থেকে তো এটি ঠিক। ঘটনা ঘটে থাকুক বা না থাকুক আমাদের কাজ তো সিদ্ধান্ত নিয়ে। যদি কোনো ঘটনাকে অসম্ভব বলে মনে হয় তবে তাকে বাদ দিয়ে দাও॥১৮১॥

প্রশ্ন—ভক্ত যে নিজেকে ভগবানের বলে মনে করে তাতে সে কি শরীর-সহিত তা মনে করে, নাকি শরীর-রহিত ভাবে মনে করে ?

উত্তর—স্বয়ং-কে ভগবানের মনে করলে শরীরও সঙ্গে থাকে কিন্তু

---

[১]নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েৎযঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৬)

শরীরকে প্রধান মনে করলে স্বয়ং সঙ্গে থাকে না। কেননা স্বতন্ত্র সত্তা স্বয়ং-এর হয়, শরীরের হয় না। ভক্তিতে সৎ-এর সঙ্গে অ-সৎও এসে যায়। কিন্তু সাংসারিক ভোগ করার সময় অ-সৎ-এর সঙ্গে সৎ-ও এসে যায় অর্থাৎ ভোক্তা, ভোগ এবং ভোগ্য— তিনটিই অ-সৎ হয়ে যায়॥১৮২॥

প্রশ্ন—ভগবানের প্রতি ভক্তের ভাব কেমন হয়ে থাকে ?

উত্তর—ভগবানের প্রতি ভক্তের অনন্য ভাব থাকে। তার আকর্ষণ কেবল ভগবানের দিকে থাকে। ভগবান ছাড়া আর কিছুকেই সে নিজের বলে মনে করে না। তার একমাত্র ভগবানের সঙ্গেই গাঢ় একাত্মবোধ থাকে। তার ভাব থাকে ভগবানকে সুখ দেওয়া—**'তৎসুখসুখিত্বম্'**। ভগবানের সুখের জন্য সে নিজের সুখ ত্যাগ করে দেয়। ভগবান কেমন, বা কেমন নন সেই চিন্তা না করে সে, ভগবান কী ভাবে সুখ লাভ করবেন তার জন্য নিজের সাধ্যানুসারে সর্বদা চেষ্টা করে॥১৮৩॥

প্রশ্ন—ভক্ত কী জানে এবং কী মানে ?

উত্তর—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কণামাত্র বস্তুও নিজের নয় ভক্ত এই কথা 'জানে' আর কেবল প্রভুই আমার এই কথা সে 'মানে'॥১৮৪॥

ভক্তি

প্রশ্ন—ভক্তি কী করে পাওয়া যায় ?

উত্তর—ভগবানের ভক্তগণের সঙ্গ করলে, তাঁদের মুখে ভগবানের মহিমা শুনলে, ভক্তদের চরিত্র পাঠ করলে এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে ভক্তি লাভ হয়। ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের বিশেষ কৃপার ফলেও ভক্তি লাভ হয়—

মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা।

(নারদভক্তিসূত্র ৩৮)

'ভক্তি প্রধানত ভগবৎপ্রেমী মহাপুরুষদের কৃপায় অথবা ভগবৎকৃপার লেশমাত্র থেকেই লাভ হয়।'

ভগতি তাত অনুপম সুখমূলা।
মিলই জো সন্ত হোঁই অনুকূলা॥

(শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ১৬।২)॥১৮৫॥

প্রশ্ন—ভক্তি এবং ভক্তিযোগে কী পার্থক্য ?

উত্তর — সকাম ভাব হল 'ভক্তি' আর নিষ্কামভাব থাকলে 'ভক্তিযোগ' হয়। নিষ্কামভাব হলে তবেই 'যোগ' হয়। কেবল 'কর্ম' বা কেবল 'জ্ঞান' থেকে কোনো লাভ হয় না। তবে কেবল 'ভক্তি' থেকে লাভ হয়। কেননা ভক্তিতে ভগবানের সম্বন্ধ থাকে। এজন্য ভগবান সকামবিশিষ্ট (আর্ত এবং অর্থার্থী) ভক্তদেরও উদার বলেছেন—**'উদারাঃ সর্ব এবৈতে'** (গীতা ৭।২৮)॥১৮৬॥

প্রশ্ন—ভক্তি এবং শরণাগতির মধ্যে কোথায় পার্থক্য ?

উত্তর—ভক্তি হলো ব্যাপক এবং শরণাগতি তার অন্তর্গত। যেখানে নয় প্রকারের ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে আত্মনিবেদনকে (শরণাগতি) তার একটি অঙ্গ বলা হয়েছে। যথা

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।২৩) ॥১৮৭॥

প্রশ্ন—সকল সাধনার শেষে তো ভক্তি লাভ হয়, কিন্তু সাধনার প্রারম্ভেই তা কী করে লাভ হতে পারে ?

উত্তর—যখন মানুষের মধ্য থেকে সাংসারিক আকর্ষণ বিদূরিত হয় এবং পরমাত্মার প্রতি আকর্ষণ জাগে তখন সে সাধনায় নিয়োজিত হয়। পরমাত্মার প্রতি আকর্ষণ ছাড়া সাধনা হবে কী করে ? এই আকর্ষণই হলো ভক্তি। অতএব ভক্তি সকল সাধনার প্রারম্ভেই পারমার্থিক আকর্ষণের রূপে থাকে॥১৮৮॥

প্রশ্ন—রামায়ণে কাকভুষুণ্ডি ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনেছেন আর যোগবাশিষ্ঠে তিনি জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনেছেন। আমরা কোন্‌টিকে ঠিক মনে করব ?

উত্তর—গভীর চিন্তা করলে দেখা যাবে তত্ত্ব একই। সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ (মুক্ত) করলে জ্ঞান এবং ভক্তি—দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না, কেবল দৃষ্টিভঙ্গিতে (সাধন-দৃষ্টিতে) পার্থক্য থাকে—

ভগতিহি গ্যানহি নহিঁ কছু ভেদা।
উভয় হরহিঁ ভব সংভব খেদা॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৫।৭)

প্রেমবিহীন জ্ঞান পরিণত হয় শূণ্যতায় আর জ্ঞান-বিরহিত প্রেম পরিণত হয় আসক্তিতে। জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি সুগম এবং শ্রেষ্ঠও। ভগবানের কৃপার আশ্রয় নিলে তা সুগম আর প্রেম হওয়ায় সেটি শ্রেষ্ঠ॥১৮৯॥

প্রশ্ন—মুক্তি লাভের পর যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য ভাব হয়ে থাকে তা কোন্ আধারের উপর হয় ?

উত্তর—আগেকার (সাধনাবস্থার) সংস্কারকে নিয়ে হয়ে থাকে॥১৯০॥

প্রশ্ন—ভগবান বিরহ কেন দেন ?

উত্তর—ভগবান বিরহ এই জন্যই দেন যাতে ভক্ত নিজের মধ্যে প্রেমের স্বল্পতা অনুভব করতে পারে এবং স্বল্পতা অনুভব করার দ্বারা প্রেম বর্ধিত হয়। কেননা বিরহ ব্যতীত প্রেম প্রতি মুহূর্তে বর্ধিত হয় না। ভগবান ভক্তকে সেই আস্বাদ অনুভব করাতে চান যা তাঁর ভিতরে আছে॥১৯১॥

প্রশ্ন—শরীর চিন্ময় কী করে হয় ? যেমন, ভক্তিমতি মীরার শরীর চিন্ময় হয়ে গিয়ে ভগবানের বিগ্রহে লীন হয়ে গিয়েছিল ।

উত্তর—যখন ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরক্তি প্রগাঢ় হয় তখন তার শরীরও চিন্ময় হয়ে যায়। তার অন্তরের ভাব এত দৃঢ় হয়ে যায় যে তা মন-বুদ্ধি-শরীরে নেমে আসে। শরীর চিন্ময় হয়ে গেলে ভক্ত ভগবানের অবতার শরীরের মতো হয়ে যায়। তার মধ্যে কোনো ব্যাধি আসে না॥১৯২॥

প্রশ্ন—শরীর নির্বাহের জন্য সংসারের উপর নির্ভর করতে হয়। তাহলে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা কেমন করে হবে ?

উত্তর—যেমন শিশু খেলনা নিয়ে খেলে, কিন্তু তার নির্ভরতা থাকে মায়ের

উপর। তেমনই আচরণে অন্যের উপর নির্ভরতা থাকলেও অন্তরে সম্পূর্ণ নির্ভরতা ভগবানের উপরেই থাকা চাই। বাস্তবে শরীরের নির্বাহ সংসারের উপর নির্ভরশীল হলে হয় না, তা হয় ভাগ্য অনুসারে॥১৯৩॥

~~○~~

ভগবান

প্রশ্ন—ভগবানকে কেন প্রয়োজন ?

উত্তর—নিজের অপূর্ণতা জানি বলে। আমাদের এমন একজন সাথী চাই যে আমাদের ভালবাসবে, আমাদের আশ্রয় দেবে এবং কখনও আমাদের কাছ থেকে চলে যাবে না, সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকবে। এমন সাথী একমাত্র ঈশ্বরই হতে পারেন। তাৎপর্য হলো এই যে, প্রেমের জন্য আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের পূর্তি নিজেদের দ্বারা হয় না। সংসারের দ্বারাও হতে পারে না। তার পূর্তি ঈশ্বরের দ্বারাই হতে পারে॥১৯৪॥

প্রশ্ন—ঈশ্বরের প্রয়োজন কী করে জাগ্রত হবে ?

উত্তর—উদ্দেশ্য প্রেমের থাকলে এবং সংসার থেকে মমতা-আসক্তি দূর হলে ঈশ্বরের প্রয়োজন জাগ্রত হবে॥১৯৫॥

প্রশ্ন—শাস্ত্র এবং সন্ত পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করেন। এক একজন এক এক রকম কথা বলেন। কার কথা মানব ?

উত্তর—পরমাত্মা কী একথা কেউ জানে না। তিনি সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার সব কিছু। তাঁর বিষয়ে যা কিছু বলা হয় তা নিজেদের বোঝার জন্য এবং তাতে প্রক্রিয়া ভেদ আছে।

আজ পর্যন্ত পরমাত্মার যত বর্ণনা করা হয়েছে সেইগুলি সব মিলিত করলেও পরমাত্মার সম্পূর্ণ বর্ণনা হয় না। যদি তা হয় তাহলে পরমাত্মা আর অসীম থাকেন না, তিনি সীমিত হয়ে যান। লোকেরা নিজেদের মত এবং সম্প্রদায় অনুসারে পরমাত্মার বর্ণনা করেন। পরমাত্মার এমন দয়াশীল বিধান যে তাঁর যে কোনো অঙ্গকে (নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম) ধরলেই

তাঁকে লাভ করা যায়।

সাধককে কেবল এই কথাটুকু মেনে নিতে হবে যে 'পরমাত্মা আছেন'। তিনি কেমন ? কেমন রূপ বিশিষ্ট ? কোথায় থাকেন ? কী করেন ? প্রভৃতি কথায় যদি সাধক বুদ্ধি খাটান তাহলে বিবাদ সৃষ্টি হবে, এক নতুন ঝামেলা সৃষ্টি হবে। প্রহ্লাদ নরসিংহ রূপের চিন্তন-ধ্যান করেননি, তাঁকে ইষ্ট বলে মানেননি। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে কেবল এইটুকু মেনে নিয়েছিলেন যে 'ভগবান আছেন এবং তিনিই আমার আপন'। গজেন্দ্রও ভগবানকে এইরকম মনে করে ডেকেছিলেন যে 'কোনো এক ঈশ্বর আছেন'॥১৯৬॥

প্রশ্ন—যখন কেউ পরমাত্মার বর্ণনা করতেই পারেন না তখন শাস্ত্রে, সন্ত বাণীতে পরমাত্মার যে বর্ণনা আছে তার সার্থকতা কী ?

উত্তর—বর্ণনা যেমন আছে সেই রকম মনে করে সাধনা করলে পরমাত্মাকে পাওয়া যায়। এজন্য সেই বর্ণনা যথোপযোগী॥১৯৭॥

প্রশ্ন—ভগবানের উপর বিশ্বাস দৃঢ় হবে কিভাবে ?

উত্তর—বিবেকবিরোধী বিশ্বাসকে ত্যাগ করলে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায়। বিশ্বাস, সম্বন্ধ এবং কর্ম— এই তিনটি বিবেকবিরোধী যেন না হয়। সংসারের প্রতি বিশ্বাস হলো বিবেক বিরোধী 'বিশ্বাস'। সংসারকে নিজস্ব মনে করা বিবেক বিরোধী 'সম্বন্ধ'। শাস্ত্র নিষিদ্ধ তথা সকামভাবে কর্ম করা বিবেকবিরোধী 'কর্ম'।

বিশ্বাসবিবেক সমর্থিত হয় না। যেখানে বিবেকের প্রাধান্য সেখানে বিশ্বাস থাকে না আর যেখানে বিশ্বাসের প্রাধান্য সেখানে বিবেক থাকে না। ভগবানের কাছেও বিশ্বাস যা করতে হবে। বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছু যা করবার প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস হলো প্রেমের সাধনা। 'ভগবান আছেন এবং তিনি আমার আপন'— এই বিশ্বাস থেকে প্রেম উৎপন্ন হয়॥১৯৮॥

প্রশ্ন—ভগবান দয়ালু, নাকি ন্যায়কারী ?

উত্তর—ভগবান সংসারের দৃষ্টিতে 'ন্যায়কারী', জ্ঞানের দৃষ্টিতে 'উদাসীন' এবং ভক্তির দৃষ্টিতে 'দয়ালু'। ভগবান তিন রকমই আবার তিনটি

থেকে বিমুক্ত। পার্থক্য কেবল আমাদের দৃষ্টিতে।

ভগবানের মধ্যে পরস্পরবিরোধী সকল ভাব থাকে।[১] তিনি দয়ালু, উদাসীন, পক্ষপাতী, সব কিছুই তিনি। নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে আমরা বুঝতে পারি না। ভক্তের ভাবের দ্বারা ভগবানেরও ভাব বদলে যায়। ভগবানের ভাবের কথা কেউ বলতে পারে না। বলা তো দূরের কথা বুঝতেই পারে না। তিনি সব দিক থেকেই অনন্ত, অপার, অসীম !

কোনো বস্তু 'কেমন, বা কেমন নয়' তা চিন্তা করা তখনই সার্থক হতে পারে যদি আমরা সেটিকে ত্যাগ করতে সমর্থ হই ! পরমাত্মাকে কেউ ত্যাগ করতে পারে না। তাহলে তিনি কেমন, কেমন নয় একথা ভাববার প্রয়োজন কী ? তিনি যেমনই হন না কেন, তিনি আমাদের।[২]॥১৯৯॥

প্রশ্ন—চোর একটি মন্দিরে মূর্তি চুরি করতে এসেছিল। সেখানকার পূজারী বলেছিল, আমি বেঁচে থাকতে মূর্তি নিয়ে যেতে দেব না। সংঘর্ষ হলো এবং পূজারী মারা গেল। ভগবান কেন তাঁকে রক্ষা করেননি ?

উত্তর—এটি ছিল পূজারীর জেদ, প্রেম নয়। ভগবান জেদের দ্বারা জাগ্রত হন না, প্রেমের দ্বারা হন—

হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা। প্রেম তে প্রগট হোহিঁ মৈ জানা॥

(শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ১৮৫।৩)

---

[১]**যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।**
মত্ত এবেতি তান্বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ (গীতা ৭।১২)

'যত সাত্ত্বিক ভাব এবং যত রাজসিক ভাব আছে তথা তামস ভাব আছে সেই সবই আমা থেকেই হয়ে থাকে, সেগুলিকে এইভাবেই মনে কোরো। কিন্তু আমি সেগুলিতে এবং সেগুলি আমাতে নেই।'

[২]**অসুন্দরঃ সুন্দরশেখরো বা গুণৈর্বিহীনো গুণীনাং বরো বা।**
দ্বেষী ময়ি স্যাৎ করুণাম্বুধির্বা শ্যামঃ স এবাদ্য গতির্মমায়ম্॥

'আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ অসুন্দর হন অথবা সুন্দর শিরোমণি হন, গুণহীন হন অথবা গুণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন, আমার প্রতি তাঁর দ্বেষ থাকুক অথবা তিনি কৃপাসিন্ধু রূপে কৃপা করুন, তিনি যেমন খুশী হন, তিনিই আমার একমাত্র গতি।'

পূজারী নিহত হওয়ায় বাস্তবে ভগবান তাকে পাপ থেকে রক্ষা করেছিলেন অর্থাৎ তার পাপ দূর হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই ঘটনা এক রকম শোনা যায় কিন্তু বাস্তবে তা হয়ে থাকে অন্য রকম। বাস্তবে যে কী হয়েছিল তা কে জানে ?

কোনো ঘটনায় ভগবানের কোন্ কল্যাণ নিহিত তা আমাদের বুদ্ধি ধরতে পারে না। আমরা যদি নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে ভগবানকে পরীক্ষা করি তাহলে ভগবান ফেল করে যাবেন। এজন্য নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করবেন না। বরং নিজেদের বুদ্ধি তাঁকে অর্পণ করে দিয়ে ভাবুন যে ভগবান যা কিছু করেন তাতে তাঁর কৃপা এবং সকলের কল্যাণ নিহীত থাকে॥২০০॥

প্রশ্ন—এমন ঘটনার কথা পড়া এবং শোনা যায় যে ভগবান কখনও বিপদে রক্ষা করেন, আবার কখনও রক্ষা করেন না। এর কী কারণ ?

উত্তর—ভগবান ভাগ্য অনুসারে ব্যবস্থা করেন। যদি ভাগ্যে থাকে তাহলে ভগবান রক্ষা করেন আর ভাগ্যে যদি না থাকে তাহলে রক্ষা করেন না। ভাগ্য ভোগের বিধান ভগবান করে থাকেন।

ভক্তির দৃষ্টিতে যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে, যেমন শিশুকে মা কখনও ভালবাসেন আবার কখনও থাপ্পড় মারেন, কিন্তু দুটিতেই মায়ের সমান কৃপা থাকে। তেমনই ভগবান রক্ষা করুন অথবা না করুন দুটিতেই তাঁর সমান কৃপা থাকে॥২০১॥

প্রশ্ন—ভগবান যখন সকলেরই রক্ষাকারী তখন পৃথিবীতে কেন হিংসা হয় ?

উত্তর—যারা হিংসা করে ভগবান তাদের হৃদয়েও অপরকে রক্ষা করবার প্রেরণা দেন। কিন্তু কামনা প্রবল হওয়ার কারণে তারা ভগবানের কথা শুনতে পায় না॥২০২॥

প্রশ্ন—ভগবান যখন সকলের পালন পোষণ করেন তখন মানুষ কেন না খেয়ে মারা যায় ?

উত্তর—এটি তাদের ভাগ্য। ভগবান তাদের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন মনে করেননি। যেমন, বৈদ্য রুগীকে অন্ন গ্রহণ করতে বারণ করেন, তাতে তাঁর উদ্দেশ্য হলো রুগীকে নিরোগ করা। তাৎপর্য হলো, না- খেয়ে সেই সব

লোকই মারা যায় যাদের বেঁচে থাকাকে ভগবান প্রয়োজন মনে করেন না। বস্তুত কেবল পরমাত্মাই হলেন আবশ্যক বস্তু। না-খেয়ে মারা যাওয়াও এক সাধনা। তাতে পুরাতন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়।

আমরা নিজেদের দৃষ্টিতে দেখি যে ভগবানের এমন করা উচিত, এমন করা উচিত নয়। কিন্তু ভগবান আমাদের অপেক্ষা বেশি জানেন, আমাদের অপেক্ষা বেশি দয়ালু এবং আমাদের অপেক্ষা বেশি সমর্থ॥২০৩॥

প্রশ্ন—পরম উদার ভগবান থাকতেও মানুষ কেন অভাবগ্রস্ত হয় ?

উত্তর—মানুষ বিনাশশীল বস্তু ত্যাগ করে না। তাহলে ভগবান কী করে উদারতা দেখাবেন ? কেউ যদি গঙ্গার ধারে না যায়, জল পান না করে তাহলে সে শীতলতা পাবে কী করে ? যতক্ষণ পর্যন্ত বিনাশশীল বস্তুর প্রতি আকর্ষণ দূর না হচ্ছে ততক্ষণ মানুষ ভগবানের উদারতাকে বুঝতে পারবে না॥২০৪॥

প্রশ্ন—ভগবান বলেন যে তাঁকে সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায়।[১] ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তো বিষয়কে (জড়) গ্রহণ করা হয়। পরমাত্মাকে (চেতন) কী করে গ্রহণ করা হবে ?

উত্তর—সাধকদের অন্তর থেকে জড়তাকে দূর করবার উদ্দেশ্যে ভগবান এমন কথা বলেন। ভগবানের কথার তাৎপর্য হলো এই যে জড় নয় আমিই আছি। সাধক আমাকে ছাড়া যেন আর কাউকে সত্তা না দেন॥২০৫॥

প্রশ্ন—সাধুগণ বলেন যে তৃষ্ণার্তের নিকট জলরূপে, ক্ষুধার্তের নিকট খাদ্যরূপে ভগবান উপস্থিত হন। কিন্তু জল, খাদ্য তো জড় এবং পরিবর্তশীল ?

উত্তর—আমরা নিজেদের শরীর মনে করে বস্তু চাই। তাতে ভগবানও

---

[১]মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৩।২৪)

'মনের দ্বারা, বাণীর দ্বারা, দৃষ্টি তথা অন্য সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু (শব্দাদি বিষয়) গ্রহণ করা হয়, সেই সব কিছুই আমি। অতএব আমি ছাড়া আর কিছু নেই— এই সিদ্ধান্ত আপনারা বুঝুন এবং উপলব্ধি করুন।'

সেইরকম হয়ে আমাদের কাছে আসেন। আমরা অ-সৎ-এ স্থিত হয়ে দেখি, তাতে ভগবানও অ-সৎ রূপে দৃষ্ট হন। আমরা যেমন দেখতে চাই ভগবান সেইভাবে দৃষ্ট হন, কেননা ভগবানের স্বভাব হলো **'যে যথা মাং প্রপদন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্** (গীতা ৪।১১), যিনি যেভাবে আমার শরণ নেন আমি তাঁকে সেই প্রকার আশ্রয় দিয়ে থাকি।'॥২০৬॥

প্রশ্ন—ভগবান তো সুখের সাগর, তাহলে তাঁকে সুখ দেওয়ার, তাঁর সেবা করবার ভাব কেন রাখব ?

উত্তর—মায়েরা সন্তদের সেবা করেন, তাঁদের ভিক্ষা দেন। তাঁরা এই ভাব নিয়ে দেন না যে তাঁদের কাছে কোনো খাদ্য নেই। তাঁরা এই ভাব নিয়েই দেন যে তাঁদের দ্বারাও যেন সাধুর কিছু সেবা হয়। আমাদের বস্তু সাধুর সেবায় লাগুক। অনুরূপভাবে ভক্তদের মধ্যেও স্বভাবত ভগবানের সেবা করবার, তাঁকে সুখ প্রদানের ভাব থাকে। কেননা তাঁরা নিজেরাও ভগবানের এবং তাঁদের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিও ভগবানের॥২০৭॥

প্রশ্ন—যারা বাস্তবে কোনো কর্ম করেনি, কেবল ভুল করে নিজেদের কর্তা বলে মনে করেছে তাদের যখন নিম্নস্তরের বিচারকও দণ্ডাদি ফল দেন না তখন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কেন তা দেন ?

উত্তর—ঈশ্বর দণ্ড দেন না। যে কর্তা সেই-ই ভোক্তায় পরিণত হয়ে নিজেদের ভুলের ফল ভোগ করে॥২০৮॥

প্রশ্ন—আমরা ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়ে সংসারমুখীন হয়ে পড়লে ভগবান কেন সংসারের প্রতি আমাদের আসক্তি দূর করে দেন না ?

উত্তর—তার কারণ ভগবান আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। তিনি যদি তা না দিতেন তাহলে আমরা পশু-পাখির মতো হয়ে যেতাম। সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে আমরা সংসারকে নিজস্ব বলে মনে করেছি॥২০৯॥

প্রশ্ন—আমরা যখন লব্ধ স্বাধীনতার অপব্যবহার করি তখন ভগবান সেই স্বাধীনতা ফিরিয়ে নেন না কেন ?

উত্তর—যতক্ষণ আমরা স্বাধীনতা চাইতে থাকব ততক্ষণ ভগবান তা ফিরিয়ে নেন না। দিয়ে দেওয়া বস্তুকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার নেই। এমন

কাজ সজ্জনদের দ্বারা হয় না, তা ডাকাতরা করে থাকে। তবে আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতা তাঁকে দিয়ে দিই অর্থাৎ নিজেরাই নিজেদের তাঁকে অর্পণ করি, তার শরণাগত হয়ে যাই তাহলে তিনি তা ফিরিয়ে নেবেন। অর্থাৎ আমাদের মুক্ত করে ভক্ত করে দেবেন॥২১০॥

প্রশ্ন—ভগবান সব কিছুই দেন, কিন্তু নিজেকে গোপন রাখেন, এমন কেন ?

উত্তর—সাধারণত দেখা যায় যে দাতারা নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার বোধ অনুভব করেন আর গ্রহীতারা নিজেদের ছোট মনে করেন। ভগবান নিজের মধ্যে দাতার শ্রেষ্ঠত্ব বোধ এবং গ্রহীতার মধ্যে হীনতা বোধ আসতে দেন না। সেজন্য তিনি নিজেকে লুক্কায়িত রেখে দান করেন। ভগবান জীবকে তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তি দিয়ে তাঁর নিজের সমান করে নেন, আর নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখেন॥২১১॥

প্রশ্ন—সাধুরা বলেন যে দাতাও ভগবান, গ্রহীতাও ভগবান। গ্রহীতা ভগবান কী করে ?

উত্তর—ভগবান সকল জীবকে নিজের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তিনিও গ্রহীতা। বাস্তবে এক ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই। **'বাসুদেব সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯) ॥২১২॥

প্রশ্ন—প্রতিটি অণুতে ভগবান এবং প্রতিটি অণুই হলো ভগবান। এই দুটিতে কী প্রভেদ ?

উত্তর—প্রতিটি অণুতে ভগবান— এ হলো মেনে নেওয়া আর প্রতিটি অণু হলো ভগবান— এ হলো বাস্তবিকতা॥২১৩॥

প্রশ্ন—নারদভক্তিসূত্রে আছে যে অহঙ্কারের প্রতি ঈশ্বরেরও বিদ্বেষ আছে 'ঈশ্বরস্যাপ্যভিমানদ্বেষিত্বাদ্' (২৭)। ঈশ্বরের মধ্যে দ্বেষভাব হয় কি করে ?

উত্তর—অহঙ্কারকে ঈশ্বর দ্বেষ করেন, অহঙ্কারীকে করেন না। 'দ্বেষ' হওয়ার তাৎপর্য হলো এই যে তিনি অহঙ্কারকে সহ্য করেন না। কেননা অহঙ্কার থেকে ভক্তের ভীষণ ক্ষতি হয়। ভগবানের মধ্যে ভক্তের কল্যাণ করার দয়া

আছে, রাগ-দ্বেষ যুক্ত বিদ্বেষ নেই। **'সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ'** (গীতা ৯।২৯)॥২১৪॥

প্রশ্ন—সংসার নিজের নয়, তবে ভগবান নিজের। এমন কথা মেনে নিলে ভগবানের কাছ থেকে কিছু আশা, প্রত্যাশা থেকে যেতে পারে। যদি এমন মনে করা হয় যে সংসারও নিজের নয়, ভগবানও নিজের নয় তাহলে কী হয় ?

উত্তর—ভগবান নিজের, কিন্তু কিছু পাওয়ার জন্য নয়। কেবল ভগবানই নিজের, এমন কথা মনে করলে অন্য সত্তা থাকবে না এবং অন্য সত্তা না থাকলে কোনো প্রত্যাশাও থাকবে না। ভগবান ছাড়া অন্য সত্তা থাকলে প্রত্যাশা জাগতে পারে। যখন ভগবানই আমার তাহলে পাওয়ার আশা থাকবে কী করে ?

কেউই নিজের নয়, না সংসার, না পরমাত্মা। এরকম মেনে নিলে সাধক জ্ঞান মার্গে চলে যান। তখন তাঁর মুক্তি হয়ে যায়, কিন্তু প্রেম লাভ হয় না॥২১৫॥

প্রশ্ন—ভগবান নিজের জন্য, এমন কথা বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—কিছু নেওয়ার জন্য ভগবান নিজের নয়, বরং তাঁকে কিছু দেওয়ার জন্য তিনি নিজের। সেজন্য তাঁর কাছ থেকে কিছু চাইতে হয় না, কেবল তাঁকেই চাইতে হয়। ভগবান নিজের জন্য এই কথার তাৎপর্য হলো, নিজেকে অর্পণ করা এবং ভগবানকে পাওয়া। নিজের মধ্যে যে ঘাটতি তার পূর্তি ভগবান ছাড়া আর কেউ করতে পারেন না। এজন্য ভগবান নিজের॥২১৬॥

প্রশ্ন—যে যেমন ব্যবহার করে তার প্রতি সেই রকম ব্যবহার করাকে সাধুরা নিকৃষ্ট কাজ বলেছেন। তাহলে ভগবানের *'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'* (গীতা ৪।১১) এই কথার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—ভগবানের এই কথাটি (যথা-তথা) ক্রিয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে, ভাবের বিষয়ে নয়। ভাবের ক্ষেত্রে ভগবানের তো সকলের প্রতিই সমান প্রেম থাকে। মানুষের যথা-তথায় তো স্বার্থভাব থাকে। কিন্তু ভগবানের যথা-তথাতে

স্বার্থভাব নেই। বস্তুত এটি হলো ভগবানের মহত্ত্ব, কেননা কোথায় জীব আর কোথায় ভগবান তবু তিনি জীবকে নিজের সমান (মিত্র) করে নেন। তাৎপর্য হলো, ভগবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ভাব (অহঙ্কার) নেই॥২১৭॥

প্রশ্ন—জগন্নাথ (জগতের নাথ) থাকা সত্ত্বেও নিজের মধ্যে কেন অনাথ ভাব অনুভূত হয় ?

উত্তর—তার কারণ হলো নিজেরাই নাথ (মালিক) হয়ে গিয়েছি। যেমন শিশুরা মাকে ছাড়া থাকতে পারে না। কিন্তু বিবাহের পর নিজেরাই কর্তা হয়ে ওঠে আর তখন মাকে ছাড়াই থাকে। তেমনই যখন মানুষ ভগবানকে ছাড়া অন্য বস্তু বা ব্যক্তিকে নিজের মনে করে কর্তা হয়ে যায় তখন সে নিজের প্রভু (ভগবান)-কে ভুলে যায় আর মিছামিছি দুঃখ পায়। কেবল ভগবানই নিজস্ব, আর কিছুই নিজস্ব নয়, এমন কথা মেনে নিলে অনাথ ভাব দূর হয়ে যায় এবং আমরা সনাথ হয়ে যাই॥২১৮॥

প্রশ্ন—ভগবান কি সকল প্রাণীর কল্যাণ চান ?

উত্তর—যেমন সাধক ভক্ত প্রাণী মাত্রেরই কল্যাণ চান সেইরূপ ভগবানে সকলের কল্যাণের ইচ্ছা থাকে না। ভগবানের মধ্যে সকল প্রাণীর কল্যাণের সর্বজনীন ইচ্ছা থাকে, বিশেষ ইচ্ছা থাকে না। যদি তাঁর মধ্যে বিশেষ ইচ্ছা থাকত তাহলে সকলেরই কল্যাণ হতো। ভগবান স্বভাবতই কারও অহিত চান না। কারও অহিত না-চাওয়াটাই তাঁর কল্যাণ চাওয়া। তাৎপর্য হলো, ভগবানের মধ্যে শুভ ইচ্ছা হয়, অশুভ ইচ্ছা হয় না। জীবন্মুক্ত, ভগবৎপ্রেমী মহাপুরুষদের সম্পর্কেও এই কথা। তাঁদের মধ্যেও সকলের কল্যাণের সর্বজনীন ইচ্ছা থাকে। কিন্তু কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্মুখস্থ ব্যক্তির কল্যাণের বিশেষ ইচ্ছা তাঁদের মধ্যে জাগতে পারে। যেমন, চৈতন্য মহাপ্রভুর জগাই-মাধাইয়ের কল্যাণের বিশেষ ইচ্ছা হয়েছিল এবং তাদের কল্যাণ হয়েছিল॥২১৯॥

~~o~~

ভগবৎ-কৃপা

প্রশ্ন—অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি যা আসে তা কি ভাগ্যের কারণে, নাকি তা ভগবৎ কৃপা ? যখন ভগবানই কর্মের ফল দেন তখন তাঁর কৃপা আর কী করে হলো ?

উত্তর—অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি কর্মের ফল ঠিকই, কিন্তু তার বিধানকর্তা হলেন ভগবান। যেমন, কোনো মানুষ যদি জঙ্গলে গিয়ে সারা দিন পরিশ্রম করে তাহলে তাকে অর্থ কে দেবে ? সে যদি কোনো মালিকের আদেশানুসারে পরিশ্রম করে তাহলে তার মালিক তাকে পারিশ্রমিক দেবে। এই রকম, কর্মানুসারে ফল পাওয়া গেলেও সেই ফল দেবেন ভগবান, কেননা জড় হওয়ার কারণে কর্ম নিজে ফল দিতে অসমর্থ।

ভগবান হলেন কৃপার মূর্তি। তাঁর প্রত্যেকটি বিধানে কৃপা পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু কেবল ভাগ্যের দিকে লক্ষ্য রাখলে আর কৃপার দিকে দৃষ্টি না রাখলে মানুষ সেই কৃপা থেকে কোনো ফল অর্জন করতে পারে না। যেমন বাছুর তার মায়ের দুধ খেয়ে যতটা পুষ্ট হয় অন্য দুধ খেয়ে ততটা পুষ্ট হয় না। তেমনই কৃপার দিকে দৃষ্টি দিলে যেমন ফল লাভ হয় ভাগ্যের দিকে দৃষ্টি থাকলে সেইরকম ফল লাভ হয় না।

ভাগ্য (কর্মফল) তো বিনাশশীল, কিন্তু কৃপা অবিনাশী। যেমন, বালির সঙ্গে চিনি মিশে গেলে চিনিকে বালি থেকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু পিঁপড়ে বালি থেকে চিনিকে আলাদা করে নেয়, তেমনই ভক্ত ভাগ্যের মধ্যে কৃপাকে চিনে নেন।

পরিস্থিতিকে যদি কর্মফল বলে মেনে নেন তাহলে অনুকূলতায় সুখ হবে এবং প্রতিকূলতায় দুঃখ হবে। কিন্তু ভগবানের কৃপা মনে করলে দুটি পরিস্থিতিতেই আনন্দ হবে। তাই কৃপা মেনে নেওয়াতেই লাভ।

মানুষ লব্ধ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে নিজের কল্যাণ করতে পারে— এটি ভগবৎ কৃপা। যদি মানুষ কেঁদে, আর্তভাবে প্রার্থনা করে তাহলে ভগবান অশুভ কর্মের ফল (প্রতিকূলতা) ক্ষমা করে দেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে বিবেকও প্রদান করেন। এটি তাঁর কৃপা॥২২০॥

প্রশ্ন—ভগবান আমাদের প্রয়োজন পূরণ করেন কি ভাগ্য অনুসারে, নাকি ভাগ্য ছাড়াই নিজে কৃপাপরবশ হয়ে করেন ?

উত্তর—ভক্তের প্রয়োজন ভগবান নিজের কৃপাতেও পূরণ করে দেন। সন্ত-মহাত্মারাও কৃপা করে অন্যের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। যেমন, গাছের কলমও ফল-ফুল দিয়ে থাকে॥২২১॥

প্রশ্ন—ধনাদি সাংসারিক বস্তু লাভ ভগবানের কৃপায় হয়, নাকি ভাগ্যের ফলে হয় ?

উত্তর—বিনাশশীল বস্তুর প্রাপ্তিতে কৃপাকে মনে করা ভুল। কৃপা তো চিন্ময়কে লাভের জন্যই হয়। জড়তার প্রাপ্তিতে তো পতন হয়। অনুকূলতার প্রাপ্তি এবং প্রতিকূলতার বিনাশে কৃপা নেই। তা হলো কর্মফল (ভাগ্য)। জড়তা থেকে অপসারিত হয়ে চিন্ময়তাতে হওয়া, সাধনায় যুক্ত হওয়া, সৎসঙ্গে নিয়োজিত হওয়া— এই হলো ভগবানের কৃপা॥২২২॥

প্রশ্ন—ভগবানের কৃপা তো সকলের উপর সমানভাবে বর্ষিত হয়। তাহলেও তা থেকে সকলের সমান লাভ হয় না কেন ?

উত্তর—ভগবৎ কৃপার সম্মুখীন হলে লাভ হয়—

সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ।
জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড ৪৪।১)

যেমন গঙ্গার কাছে থেকেও কেউ তাতে স্নান করল না, তার জল পান করল না— এতে গঙ্গা থেকে তার কেমন করে লাভ হবে ? তেমনই সকলের উপর ভগবানের সমান কৃপা থাকলেও কেউ যদি তাঁর সম্মুখীন না হয় তাহলে তা থেকে তার কী লাভ হবে ?॥২২৩॥

প্রশ্ন—ভগবৎ কৃপার সম্মুখীন হওয়া বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর — কৃপার সম্মুখীন হওয়া হলো কৃপাকে স্বীকার করা, নিজের উপর ভগবানের কৃপাকে মেনে নেওয়া, প্রত্যেক পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর কৃপাকে অনুভব করা॥২২৪॥

প্রশ্ন—ভগবানের কৃপা এবং সাধুদের কৃপার মধ্যে প্রভেদ কোথায় ?

উত্তর—ভগবানের মধ্যে তো যথা-তথা আছে— **'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'** (গীতা ৪।১১)। কিন্তু সাধুদের মধ্যে যথা-তথা নেই। এজন্য তাঁর সম্মুখীন হলে তবেই ভগবান কৃপা করেন কিন্তু সাধুরা সকলের প্রতি কৃপা করেন। কেউ যদি প্রেমী হয়, বিদ্বেষপরায়ণ হয়, উদাসীন হয়, বিরুদ্ধ পথের পথিক হয়, দুঃখদাতা হয়, যে কোন রকমের প্রাণীই হোক না কেন— সাধুদের সকলের উপর সমানভাবে কৃপা বর্ষিত হয়।

ভগবান কৃপা করেন পিতার মতো আর সাধুরা করেন মায়ের মতো। পিতার কৃপায় বিচার থাকে এবং মায়ের কৃপায় মোহ থাকে। মোহের কারণে মা বিচারের দিকে দৃষ্টি দেন না। সাধুদের মধ্যে মোহ থাকে না, তবে প্রেম থাকে। তার কারণ সাধুরা ভুক্তভোগী অর্থাৎ তাঁরা সাংসারিক দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। সেজন্য তাঁরা দেখেন যে আগে তাঁরাও তো এমনই দুঃখী ছিলেন। অতএব অপরের দুঃখ দূর করবার জন্য তাঁরা বিশেষ কৃপা করেন॥২২৫॥

প্রশ্ন—সাধকদের প্রতি ভগবানের কৃপা স্বতঃই হয়ে থাকে, নাকি প্রার্থনা করার পর হয়ে থাকে ?

উত্তর—নিজের ভিতরের উৎকণ্ঠাই হলো প্রার্থনা। সাধক নিজের ভিতরে প্রয়োজন অনুভব করেন এবং নিজের অবস্থায় তৃপ্তি পান না। তাতে স্বতঃই কৃপা কাজ করে। অন্তরে যদি ক্ষুধা থাকে তাহলে ভগবান কোনো না কোনো উপায়ে তা পূরণ করে দেন॥২২৬॥

প্রশ্ন—ভগবানের যখন সকলের উপর সমান কৃপা তাহলে সকলকে সৎসঙ্গের সুযোগ কেন দেন না ?

উত্তর—সকলকেই দেন। কিন্তু তা থেকে সুফল লাভ করা তো আমাদের হাতে। তিনি সৎসঙ্গ যদি নাও দেন তাহলেও সকলের হৃদয়ে সৎ প্রেরণা দেন। সকলকে সাবধান করে দেন, কিন্তু মানুষ সেদিকে মন দেয় না॥২২৭॥

প্রশ্ন—সকলের উপরেই তো ভগবানের সমান কৃপা। কিন্তু সেই কৃপা কেন বোঝা যায় না ?

উত্তর—সকলে খাদ্য সমানভাবে পেলেও লোকে নিজের নিজের ক্ষুধা অনুসারে ভোজন করে। ক্ষুধা সকলের সমান নয়। তেমনই ভগবানের কৃপা

সকলের উপর সমান থাকলেও ভগবানের উপর যত বেশী নির্ভরতা থাকে ততই বেশি তাঁর কৃপা বোঝা যায়॥২২৮॥

~~O~~

ভগবৎ-দর্শন

প্রশ্ন—ভগবানের দর্শন কখন হয় ?

উত্তর—এতে তিনটি কথা আছে— (১) কখনও ব্যাকুল এবং কখনও নির্ভরতা—সেই রকম হতে থাকলে দর্শন হয়ে যায়, (২) সংসারের বা পরমাত্মার কোনো রকম ইচ্ছা না থাকলেও দর্শন হয়ে যায়, এবং (৩) কেবল ব্যাকুলতা এলেও দর্শন হয়ে যায়।

ভগবানের যদি আমাদের দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলেও তিনি স্বেচ্ছায় দর্শন দিয়ে থাকেন। ভগবান দর্শন দেবেন কিনা তা আমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে নয়। কিন্তু 'আমরা ভগবানের আর ভগবান আমাদের' এই ভাব আমাদের অধিকারে রয়েছে। সেই অধিকার অনুসারে যদি আমরা তাঁকে মেনে নেই তাহলে আর কিছুর প্রয়োজন হবে না॥২২৯॥

প্রশ্ন—ভগবানের দর্শন পেলে কী হয় ?

উত্তর—ভক্ত মুক্তি, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি যা চান তা দর্শন হলে পাওয়া যায়। যদি ভক্তের নিজের মেনে নেওয়া বিষয়ের প্রতি আগ্রহ না থাকে তাহলে দর্শন লাভে তার তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যাবে।[১] কারও মেনে নেওয়া ধারণাকে ভেঙে না দেওয়া হলো ভগবানের স্বভাব।

দর্শন লাভের পর তত্ত্বজ্ঞান হোক অথবা নাই হোক ভক্তের মধ্যে কোনো রকম ন্যূনতা থাকে না। তাঁর ন্যূনতা দূর করবার দায়িত্ব থাকে ভগবানের। ভক্তের মধ্যে তো ভগবানকে জানবার জিজ্ঞাসাই থাকে না॥২৩০॥

প্রশ্ন—এমন সাধুও হয়েছেন যারা ভগবানের দর্শনকে গুরুত্ব দেননি, এর কারণ কী ?

---

[১]মম দরসন ফল পরম অনূপা। জীব পাব নিজ সহজ সরূপা॥

(শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ৩৬।৫)

উত্তর—বেশি ভালোবাসা হলে দর্শনের ইচ্ছাই হয় না। তার কারণ প্রেমে একটি রস, মাদকতা থাকে। ভক্ত তাতেই মত্ত হয়ে যান।

প্রেম অপেক্ষা দর্শন অনিত্য। প্রেম তো সদা সর্বদা থাকে। কিন্তু দর্শন নিত্য হয় না। এজন্য বিচক্ষণ ভক্ত প্রেমই চেয়ে থাকেন। প্রেমেতেই প্রকৃত রস, মিলনে বা না-মিলনে সেই রস নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা থাকে ততক্ষণ প্রকৃত প্রেম জাগ্রত হয় না। প্রকৃত প্রেম জাগ্রত হওয়ার পর প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলন হোক বা নাই হোক, কোনো ইচ্ছা থাকে না॥ ২৩১॥

প্রশ্ন—সূর্পণখা, দুর্যোধন, শকুনি প্রভৃতিরাও ভগবানের সাকার রূপ (শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ) দর্শন করেছিলেন। তবু তাঁদের কাম-ক্রোধাদি দোষ দূর কেন হয়নি ?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ভগবানের দর্শন করেননি। তাঁরা ভগবান রাম এবং ভগবান কৃষ্ণকে ঈশ্বররূপে মনে না করে মনুষ্য রূপেই দেখতেন। তাহলে আর ঈশ্বর দর্শন কী করে হলো ? তাঁদের অন্তরে ঈশ্বরভাব বা ভক্তিভাব ছিলই না। সেজন্য তাঁরা ঈশ্বররূপে ঈশ্বরকে পাননি। সমগ্র জগৎও ঈশ্বররূপ, কিন্তু মানুষ তা কি মানে ? ॥২৩২॥

প্রশ্ন—পরমাত্মার লাভে কোনো কারক বা কর্তা থাকে না। কিন্তু সাধুদের দ্বারা অন্যদের ঈশ্বর দর্শন করাবার কথা বলা হয়। এর কী কারণ ?

উত্তর—লোকেদের দৃষ্টিতে এই রকম মনে হয়ে থাকে, বাস্তবিক তা নয়। ভগবানকে দর্শন করা এবং করান নিজেদের হাতে নয়। ভগবান দয়া করে স্বেচ্ছায় দর্শন দেন—

সোই জানই জেহি দেহু জনাঈ। জানত তুম্হহি তুম্হই হোই জাঈ॥
তুম্হরিহি কৃপাঁ তুম্হহি রঘুনন্দন। জানহিঁ ভগত ভগত উর চন্দন॥

(শ্রীরামচরিতমানস, অযোধ্যাকান্ড, ১২৭।২)

কর্তা তো স্বতন্ত্র হন—**'স্বতন্ত্রঃ কর্তা'** (পানি.অ.১।৪।৫৪), কিন্তু যিনি ভগবদ্দর্শন করান তিনি স্বতন্ত্র নন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর উপর শাসন হতে পারে না। যদি নিজের ইচ্ছা হয় তাহলে সাধুদের

কৃপা ভগবদ্দর্শনে সহায়ক হতে পারে।।২৩৩।।

প্রশ্ন—ভগবানের দর্শন হলো এবং তিনি বর চাইতে বললেন। কিন্তু চাইলাম না, তাতে কী ফল হবে?

উত্তর—চাইলে বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ হয় আর না চাইলে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়। তাই যে কিছুই চায় না তাকে ভগবান নিজেই নিজেকে দিয়ে দেন অর্থাৎ তার অধীন হয়ে যান।।২৩৪।।

প্রশ্ন—ভগবানের দর্শন হওয়ার পর ভক্ত স্তুতি করেন, নাকি স্তুতি হয়?

উত্তর—স্তুতি করেন না, স্তুতি স্বভাবতঃই হয়ে থাকে ।।২৩৫।।

~~o~~

ভগবৎ-প্রাপ্তি

প্রশ্ন—যখন ঈশ্বর লাভের জন্য মনুষ্য-শরীর পাওয়া গিয়েছে তখন তাকে কঠিন কেন মনে হয়?

উত্তর—তার কারণ ভোগে আসক্তি। ভগবান লাভ করা কঠিন নয়, ভোগের আসক্তি ত্যাগ করাই কঠিন।।২৩৬।।

প্রশ্ন—ভগবৎ লাভকে কঠিন বলুন অথবা ভোগাসক্তিকে ত্যাগ করা কঠিন বলুন, দুটি তো একই কথা?

উত্তর—না, দুটির মধ্যে খুবই পার্থক্য। ভগবৎ লাভ কঠিন মনে হলে সাধক শ্রবণ, মনন, জপ, স্বাধ্যায় প্রভৃতিতে তীব্রতা নিয়ে আসবেন কিন্তু ভোগাসক্তি ত্যাগ করার বিষয়ে তাঁর মন থাকবে না। বস্তুত ঈশ্বর লাভ তো হয়েই আছে, কেবল সংসার বন্ধনকে ত্যাগ করতে হবে।।২৩৭।।

প্রশ্ন—সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধকে কী করে ত্যাগ করা যাবে?

উত্তর—জিজ্ঞাসা যদি তীব্র হয় অথবা আর্তভাবে কেঁদে প্রার্থনা করা হয় তাহলে সংসারের সম্বন্ধ কেটে যাবে। ভগবানের কৃপায় সহসা বিবেক জাগ্রত হবে এবং সংসারের আসক্তি দূর হবে।।২৩৮।।

প্রশ্ন—ভগবৎ লাভ সুগম হয় কি করে?

উত্তর—ভগবান নিত্যলব্ধ। তিনি প্রত্যেক দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা

পরিস্থিতি এবং ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাঁর প্রাপ্তি জড়ত্ব (শরীর-সংসার) দ্বারা হয় না বরং জড়ত্বকে ত্যাগের দ্বারাই হয়। কিন্তু বিনাশশীল সংসারের দিকে দৃষ্টি থাকায়, বিনাশী সুখের প্রতি আসক্তি থাকায় আমাদের নিত্যলব্ধ পরমাত্মার অনুভূতি হয় না। আমরা জানি সংসার শরীর নশ্বর, তবু এই জানাকে আমরা গুরুত্ব দেই না। বাস্তবে 'শরীর-সংসার বিনাশশীল'—একথা আমরা শিখেছি, বুঝিনি। এজন্য বিনাশী জেনেও আমরা সুখ-লোলুপতার কারণে তাতেই মজে রয়েছি। বাস্তবে নিত্যনিবৃত্তির নিবৃত্তি এবং নিত্যপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত করতে হবে॥২৩৯॥

প্রশ্ন—নিত্যনিবৃত্তির নিবৃত্তি এবং নিত্যপ্রাপ্তিকে প্রাপ্ত করা বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর—নিত্যনিবৃত্তির নিবৃত্তি করার তাৎপর্য হলো— যা নিত্যনিবৃত্ত সেই শরীর-সংসারকে রক্ষা করার ভাবনা ত্যাগ করা অর্থাৎ সেটা টিকে থাকুক এই ইচ্ছা ত্যাগ করা। নিত্যপ্রাপ্তিকে প্রাপ্ত করার তাৎপর্য হলো যা নিত্যপ্রাপ্ত সেই পরমাত্মতত্ত্বকে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সঙ্গে স্বীকার করা।

যা কোনো এক সময় পৃথক হয়ে যাবে যা এখন পৃথকই আছে আর যাকে কোনো না কোনো সময়ে পাওয়া যাবে তা এখন প্রাপ্ত হয়ে আছে। শরীর, বস্তু, যোগ্যতা এবং সামর্থ্য হলো 'নিত্যনিবৃত্ত' অর্থাৎ সর্বদাই আমাদের থেকে আলাদা এবং পরমাত্মা হলেন 'নিত্যপ্রাপ্ত' অর্থাৎ সর্বদাই তা পাওয়া হয়ে আছে। যে তত্ত্ব সর্বত্র পূর্ণরূপে বিদ্যমান তা আমাদের থেকে দূরে থাকতে পারে না। পরমাত্মা কখনই আমাদের থেকে আলাদা হননি। তিনি আলাদা নন, আলাদা হবেন না, আর হতেও পারেন না। কেননা তাঁর সত্তা থেকেই আমরা সত্তাবান॥২৪০॥

প্রশ্ন—পরমাত্ম লাভ যখন এতই সহজ তখন তাতে কী বাধা উপস্থিত হয় ?

উত্তর—বাধা অনেক, যেমন—

(১) ভোগ এবং সঞ্চয়ে আসক্তি।

(২) পরমাত্ম লাভের জন্য তীব্র জিজ্ঞাসা (ক্ষুধা) না থাকা।

(৩) নিজেদের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা।

(৪) পরমাত্ম লাভকে সাংসারিক বস্তু লাভের মতো মনে করা। এই বোধের জন্য ক্রিয়াকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। বিবেক এবং বিচারকে গুরুত্ব না দেওয়া।

(৫) তত্ত্ব ভালভাবে জানেন এমন মহাত্মাকে না পাওয়া।

(৬) সামান্য কিছু জেনে এবং খুবই কম সাধনা করে অহঙ্কার করা।

(৭) কিছু করলে তবে পাওয়া যাবে, গুরু পাওয়া গেল না, সময় এমনই, ভাগ্যই এই রকম, আমি যোগ্য নই, আমি অধিকারী নই— এইরকম যে সংস্কার ভিতরে রয়ে গিয়েছে সেইগুলিও বাধাস্বরূপ ॥২৪১॥

প্রশ্ন—কোনো কোনো সাধক ভগবানের জন্য কাঁদেন, ব্যাকুল হন। তাহলেও তাঁরা ভগবানকে কেন পান না?

উত্তর—তাঁদের ভিতর ভগবান ছাড়াও অন্য বিষয় (সুখ-আরাম, মান সম্মান প্রভৃতির) পাওয়ার ইচ্ছা থাকে, অন্য বস্তু বা ব্যক্তির গুরুত্ব এবং আকর্ষণ থাকে। তাই ভগবানের জন্য কান্না তাৎকালিক হয়ে থাকে এবং অবস্থা যেমনকার তেমনই থেকে যায়।

একমাত্র ভগবানকে পাওয়ার ইচ্ছাই থাকা চাই—

এক বানি করুণানিধান কী।
সো প্রিয় জাকেঁ গতি ন আন কী॥

(শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ১০।৪)

তাঁরা যদি সাধনায় লেগে থাকেন তাহলে অন্য কিছু পাওয়ার ইচ্ছা দূর হয়ে ঈশ্বর প্রত্যাশা প্রবল হয়ে গেলে ভগবানকে পাওয়া যেতে পারে॥২৪২॥

প্রশ্ন—বিকার অন্তঃকরণে হয়, তাই পরমাত্ম লাভে কোনো বিকার বাধক হয় না। কিন্তু পরমাত্ম লাভে ভোগাসক্তিকে বাধকও বলা হয়েছে। দুটির মধ্যে কোন্ কথাটি ঠিক?

উত্তর—অন্তঃকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই বিকারগুলিকে নিজের মধ্যে মেনে নিলে সেই বিকারগুলি বাধক হয়ে যায়। কিন্তু অন্তঃকরণে উত্থিত বিকারগুলির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত না করলে তা বাধক হয় না॥২৪৩॥

প্রশ্ন—কোনো কারক-ই যখন ভগবানের কাছে পৌঁছাতে পারে না তাহলে সম্প্রদান এবং অপাদান কারকও কি পৌঁছাতে পারে না ? স্বেচ্ছায় নিজেকে ভগবানকে দেওয়া হলো সম্প্রদান আর সংসারকে ত্যাগ করা হলো অপাদান।

উত্তর—ভগবানে অর্পিত হওয়া এবং সংসারকে ত্যাগ করা ক্রিয়াত্মক সম্প্রদান, অপাদান নয়। এই দুটিই ক্রিয়া নয়, বস্তুত নিজের ভুল ধারণাগুলিরই ত্যাগ। কারণ বাস্তবে আমরা ভগবানের, সংসারের নয়।

গ্রাম থেকে লোক এসেছে— এতে গ্রাম হলো অপাদান । লোকটি দান করেছে— এখানে দাতা হলো সম্প্রদান। অপাদানে আসার ক্রিয়া এবং সম্প্রদানে দেওয়ার ক্রিয়া— এই দুটি ক্রিয়াই পরমাত্মা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। হ্যাঁ, সৎ ক্রিয়া নিরর্থক হয় না, বরং পরমাত্ম প্রাপ্তিতে সহায়ক হয়। সৎ-অংশ কল্যাণকারী হয়, ক্রিয়া-অংশ নয়।

মূল কথা হলো পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য জড়ত্বের (ক্রিয়া এবং পদার্থ অথবা শরীর-সংসার) সহায়তা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। জড়ত্বকে ত্যাগ করলেই তাকে পাওয়া যায়। ক্রিয়া এবং বস্তু— দুটিই জড়। ক্রিয়ার আরম্ভ এবং অবসান হয়, বস্তুর উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়। এসব চিরকাল থেকে যাওয়ার জিনিস নয়॥২৪৪॥

প্রশ্ন—শরীরের সাহায্য ছাড়া আমরা কেমন করে সাধনা করব ?

উত্তর—সাধনায় ক্রিয়ার প্রাধান্য নেই, বিবেক এবং ভাবেরই প্রাধান্য থাকে। এজন্য শরীরের সাহায্য ছাড়াই আমরা কামনা রহিত হতে পারি, ভগবানকে নিজেদের বলে মনে করতে পারি এবং শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপূর্বক তাঁর শরণাগত হতে পারি। এমন হওয়ার জন্য শরীরের প্রয়োজন নেই।

সাংসারিক বস্তু লাভ তো শরীরের দ্বারাই হয়। কিন্তু পরমাত্মা লাভ শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করলেই হয়। পরমাত্মা লাভের জন্য শরীর লেশমাত্র সহায়ক অথবা বাধক নয়। পরমাত্মতত্ত্বে ক্রিয়া নেই। এজন্য ক্রিয়ারহিত হলেই তাঁকে পাওয়া যায়॥২৪৫॥

প্রশ্ন—পরমাত্ম লাভ ভাব থেকে হয়, ক্রিয়ার দ্বারা হয় না। কিন্তু ভাবও তো মন-বুদ্ধি থেকে সৃষ্ট হয় ?

উত্তর—ভাব অনেক রকমের হয়। মন এবং বুদ্ধিতে রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি ভাব সৃষ্টি হয়। কিন্তু 'আমি ভগবানের, এবং ভগবান আমার' এই সম্বন্ধাত্মক ভাব স্বয়ং-এ থাকে॥২৪৬॥

প্রশ্ন—সংসারকে এবং পরমাত্মাকে লাভ করার প্রক্রিয়া এক নয়—একথার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—সংসারকে লাভ করা হলো অপ্রাপ্তকে পাওয়া আর পরমাত্মাকে লাভ করা হলো নিত্যপ্রাপ্তকে পাওয়া। সংসারকে লাভ করায় 'করা'ই প্রধান আর পরমাত্মার লাভে 'না-করা' প্রধান। সাংসারিক বস্তুকে নির্মাণ করতে হয়, কোথাও থেকে নিয়ে আসতে হয় । কিন্তু পরমাত্মাকে তৈরি করতে হয় না, কোথাও থেকে আনতেও হয় না। কেননা পরমাত্মা সকল দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, পরিস্থিতি, ঘটনা এবং অবস্থায় সমানরূপে সর্বদাই বিদ্যমান রয়েছেন । যে তত্ত্ব সকল দেশ, কাল প্রভৃতিতে বিদ্যমান রয়েছে তাকে ক্রিয়ার দ্বারা কী করে পাওয়া যাবে ? ক্রিয়ায় তো সেটি আমাদের থেকে দূরে থাকবে॥২৪৭॥

প্রশ্ন—যে তত্ত্ব দৃষ্টির অগোচর, সেটি কেমন করে দেখা যাবে ?

উত্তর—যা কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সেগুলির প্রতি অস্থি-ভাব না রাখলে এবং গুরুত্ব না দিলে দর্শনযোগ্য দৃষ্ট হতে থাকবে॥২৪৮॥

প্রশ্ন—ভগবান যখন মনুষ্যজন্ম দিয়েছেন, সৎসঙ্গের সুযোগও দিয়েছেন তখন তাঁকে লাভ করতে দেরি হয় কেন ?

উত্তর—ভগবান যা দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার না করার জন্যই দেরি হয়। যতটা সময়, জ্ঞান, সামর্থ্য এবং সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে হবে। ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া বস্তুগুলিকে ব্যক্তিগত মনে করলে নিজের মধ্যে দুর্বলতা আসে। তাতে সেগুলির যথোচিত ব্যবহার আমরা করতে পারি না। শক্তির অভাব বাধক নয়। আসলে শক্তির অপব্যবহারই হলো বাধা। 'করতে পারি না' - এই দুর্বলতা বাধা নয়, বরং 'করতে পারি, কিন্তু করি না' - এই দুর্বলতাই হলো বাধা॥২৪৯॥

প্রশ্ন—উপনিষদে বলা হয়েছে যে বলহীন, মানুষের পরমাত্ম প্রাপ্তি হয়

না—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' (মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।২।৪)—এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এখানে 'বল' শব্দের অর্থ— উৎসাহ, সাহস। যার উৎসাহ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, যার সাহস শেষ হয়ে গিয়েছে সেই মানুষই 'বলহীন'।

নির্বলতা দু'ধরণের হয়— (১) করতে অসমর্থ হওয়া এবং (২) করতে সমর্থ হয়েও না করা। জানি এবং করতেও পারি তবু তা না করা— এই দুর্বলতা থাকলে মানুষ পরমাত্ম লাভ করতে পারে না। এজন্য সাধুরা বলেছেন—

হিম্মত মত ছাঁড়ো নরাঁ, মুখ তে কহতাঁ রাম।
'হরিয়া' হিম্মত সে কিয়া, ধ্রুবকা অটল ধাম॥ ২৫০॥

প্রশ্ন—তীব্র ব্যাকুলতা না থাকলেও কি ভগবানকে লাভ করা যায় ?

উত্তর—তিনটি উপায়ে ভগবানকে লাভ করা যায়— (১) নির্বলতার দ্বারা, (২) নির্ভরতায়, এবং (৩) কখনও নির্বলতা, কখনও নির্ভরতা থাকলে। তাৎপর্য হলো, ব্যাকুলতা যদি তীব্র হয় তাহলে ভগবান লাভ হবে অথবা যদি ভগবানের কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা থাকে যে যা হবে তা তাঁর কৃপাতেই হবে তাহলেও ঈশ্বর লাভ হবে। কখনও নির্বলতা (ব্যাকুলতা) এবং কখনও নির্ভরতা থাকলে দুটির মধ্যে কোনো একটি যখন পূর্ণতা পাবে তখনও ভগবৎ লাভ হবে॥২৫১॥

প্রশ্ন—প্রায় সকল সাধকের মধ্যেই তো কখনও নির্বলতা এবং কখনও নির্ভরতা থাকে, তাহলে তা পূর্ণ কেন হয় না ?

উত্তর—সাধনায় যদি যৎকিঞ্চিৎ নিজের বল, যোগ্যতার আশ্রয় নেওয়া হয় তাহলে সম্পূর্ণরূপে নির্বলতার অনুভব হয় না এবং তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতাও আসে না। সেজন্য এই আশা দূর করতে হবে যে আমরা নিজেদের শক্তিতে ঈশ্বর লাভ করব। কিন্তু ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠাপূর্ণ হতে হবে। তার কারণ যখন ভগবানের শক্তিতে, তাঁর কৃপাতেই ঈশ্বর লাভ হবে তখন আমরা কেন নিরাশ হব ? ॥২৫২॥

প্রশ্ন—অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হলে পরমাত্মায় রুচি হবে না। আর রুচি না

হলে পরমাত্ম লাভ হবে না। অতএব পরমাত্ম লাভের জন্য অন্তঃকরণের শুদ্ধি হলো কারণ ?

উত্তর—পরমাত্মলাভে অন্তঃকরণের শুদ্ধি কারণ নয়। কেননা পরমাত্মলাভ করণের দ্বারা হয় না। প্রত্যুত করণের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ থেকে হয়। অন্তঃকরণ অশুদ্ধ হলে পরমাত্মার দিকে রুচি হবে না— এমন নিয়ম নেই। কোনো বড় বিপদ এলে, কোনো সাধুর কৃপায় অথবা অন্য কোনো কারণে অশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট মানুষও পরমাত্মায় যুক্ত হয়ে যেতে পারে। কেননা মূলে সে পরমাত্মারই অংশ। তাই গীতাতে বলা হয়েছে—

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ (৪।৩৬)

'যদি তুমি সকল পাপী অপেক্ষা বেশি পাপী হও তাহলেও তুমি জ্ঞানরূপী নৌকার দ্বারা নিঃসন্দেহে সমগ্র পাপ-সমুদ্র ভালভাবে পার হয়ে যাবে।'

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ (৯।৩০)

'যদি কোনো অতিশয় দুরাচারীও অনন্যভক্ত হয়ে আমার ভজনা করে তাহলে তাকে সাধু বলেই মানা উচিত। কেননা সে যথাযথ নিশ্চয় করে নিয়েছে।' ॥২৫৩॥

প্রশ্ন—যা আমাদের , তা আমরা কেন পাই না ?

উত্তর—যা আমাদের নয়, তাকে যদি নিজেদের বলে না মানি তাহলে তাকে তো পেয়েই আছি। আমাদের কেবল ভুল ভাঙ্গতে হবে। সুখের কামনা, আশা এবং ভোগের কারণেই 'সংসার আমাদের নয়' এই বিশ্বাস জাগে না॥ ২৫৪॥

~~○~~

মনুষ্য-জন্ম

প্রশ্ন—মনুষ্য-জন্ম কি ভাগ্যে পাওয়া যায় নাকি ভগবৎ কৃপায় ?

উত্তর—ভগবৎ কৃপায় পাওয়া যায়। যদি ভাগ্যক্রমে পাওয়া যায় তবে চুরাশি

লক্ষ যোনি অতিক্রম করে পেতে হয়। কিন্তু ভগবান কর্মফল সম্পূর্ণ ভোগ হওয়ার আগেই কৃপা করে মনুষ্য-শরীর প্রদান করেন। তাৎপর্য হলো, মনুষ্য-শরীর তো কর্মের ফলে পাওয়া যায় তবে ভগবান জীবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ভোগ সম্পূর্ণ হবার আগেই মনুষ্য-শরীর দিয়ে দেন—এ হলো ভগবানের কৃপা॥২৫৫॥[১]

প্রশ্ন—মনুষ্য-জন্ম পাওয়া যদি ভগবৎ কৃপার কারণে হয় তাহলে কোনো কোনো শিশু যে জন্মের পরেই মারা যায় অথবা তাদের মস্তিষ্ক জন্মের সময় থেকেই বিকৃত হয় তাদের কল্যাণ কী করে হবে ?

উত্তর—তাদের আকৃতি তো মানুষেরই হয়ে থাকে, কিন্তু বাস্তবে সেটি হলো ভোগযোনি। ভোগ ভুগলে তাদের শুদ্ধিই হবে। বাস্তবে আকৃতির নাম মানুষ নয়। বিবেক-শক্তির নাম হলো মানুষ। বিবেক ছাড়া যা তা হলো মানুষের কাঠামো, মানুষ নয়। সাধুদের কৃপায় তাদেরও কল্যাণ হতে পারে।

পশুদের মধ্যেও যতটা অংশে বিবেক থাকে, ততটা অংশে তারা মানুষ। মানুষদের মধ্যেও যদি অবিবেক থাকে তাহলে তারা পশু—**'মনুষ্যরূপেণ মৃগাংশ্চরন্তি'**। বিবেক বিকশিত হলেই তারা মানুষরূপে গণ্য হতে পারে॥২৫৬॥

প্রশ্ন—বিবেক তো অনাদি এবং অন্য যোনিরাও তা পায়। তাহলে মনুষ্যযোনির আর কী মহিমা থাকল ?

উত্তর—মনুষ্য দেহের মস্তিষ্ক বিশেষ প্রকারের সৃষ্ট। এতে বিবেক বিশেষ রূপে জাগ্রত হতে পারে। অন্য যোনিতে সেরকম মস্তিষ্ক নেই। তাই তাদের বিবেক জীবন-নির্বাহ পর্যন্ত সীমিত থাকে। কর্তব্য এবং অকর্তব্য, সৎ এবং অ-সতের বিবেক মনুষ্য-শরীরেই জাগ্রত হতে পারে। একে গুরুত্ব দিয়ে মানুষ নিজের কল্যাণ করতে পারে॥২৫৭॥

প্রশ্ন—সাধুরা বলেন যে শরীর নিজের কোনো কাজে আসে না, এটি কেমন ?

---

[১]কবহুঁক করি করুনা নর দেহী। দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী॥
(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৪।৩)

উত্তর—বাস্তবে শরীর নিজের কাজে আসে না, বিবেকই নিজের কাজে আসে। এই বিবেক অন্য যোনিতে নেই। মনুষ্য-শরীরে বিবেককে গুরুত্ব দিলে শরীরে আসক্তির ত্যাগই নিজের কাজে আসে। শরীরের আসক্তি ত্যাগ করলে তা নিজের জন্য এবং শরীরের দ্বারা সেবা করলে তা অপরের জন্য উপযোগী হয়॥২৫৮॥

প্রশ্ন—ত্যাগ তো নিজের জন্য করা হলো ?

উত্তর—ত্যাগও নিজের জন্য নয়, বরং ত্যাগের ফল (শান্তি) হলো নিজের জন্য—**'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্'** (গীতা ১২।১২)। ত্যাগ করা বস্তু অন্যের কাজে আসে। ত্যাগের ফল (শান্তি) থেকেও যদি সুখ নেন তাহলে তাও বন্ধন-কারক হবে॥ ২৫৯ ॥

প্রশ্ন—জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুদের বৈষ্ণবী মায়া ঘিরে ফেলে —এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—বৈষ্ণবী মায়া হলো যার দ্বারা সমগ্র সংসার রচিত হয়। বাইরের মায়ার প্রভাব তখন হয় যখন নিজের ভিতর মায়া থাকে। আমাদের ভিতর কু-সংস্কার (কুসঙ্গের সংকার) থাকে । সেকারণেই বাইরের কুসঙ্গের প্রভাব পড়ে। ভিতরের কু-সংস্কার বশেই অ-সতের সত্তা স্বীকার করা হয় এবং তাকে গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা হয় ॥২৬০॥

প্রশ্ন—মানুষের পতনের কারণ কী ?

উত্তর—ভোগের ইচ্ছা এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছা— এই দুটি ইচ্ছার কারণে মানুষের পতন হয়। তাৎপর্য হলো, সংসার থেকে কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছাই পতন ঘটায়॥২৬১॥

~~o~~

মুক্তি (কল্যাণ)

প্রশ্ন—মুক্ত হয়ে গেলে নিজের মধ্যে কী বৈশিষ্ট্য এসে যায় ?

উত্তর—মুক্ত হয়ে যাবার পর কোনো রকম বৈশিষ্ট্য আসে না। বস্তুত নিজের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় তা অপসারিত হয়। তাৎপর্য হলো, মুক্ত হয়ে

যাবার পর বৈশিষ্ট্য যে দেখে (ব্যক্তিত্ব) সেই থাকে না। ব্যাষ্টি-ভাব দূর হয়ে যায়। কোনো কিছুতেই নিজের অনস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না।

মুক্ত হয়ে যাবার পরে 'আমি একটি শরীরে রয়েছি' এই ভাবনাও থাকে না, আবার 'আমি সব জায়গাতেই রয়েছি' এই ভাবনাও থাকে না। বস্তুত 'আমি' এই ভাবনাই থাকে না। বৈশিষ্ট্য আসে প্রেম থেকে।[১] জ্ঞান থেকে বৈশিষ্ট্য অপসারিত হয়ে সর্বত্র সমভাব হয়ে থাকে॥২৬২॥

প্রশ্ন—মুক্ত হয়ে গেলে আর বন্ধন কেন হয় না ?

উত্তর—তার কারণ বাস্তবে বন্ধন নেই। তা হলো আমাদের সৃষ্ট। বন্ধন হলো কৃত্রিম (ভ্রান্তি), মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ॥২৬৩॥

প্রশ্ন—বেদান্তে চারটি প্রতিবন্ধের কথা মানা হয়েছে— সংশয় (প্রমাণগত এবং প্রমেয়গত), বিপরীত ভাবনা, অসম্ভাবনা এবং বিষয়াসক্তি। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও কেউ কি জীবন্মুক্ত হতে পারে ?

উত্তর—হ্যাঁ, পারে। তীব্র জিজ্ঞাসা থাকলে প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর হয়ে যায়॥২৬৪॥

প্রশ্ন—পরমাত্মা কর্তা নিরপেক্ষ, কিন্তু মুক্তির ইচ্ছা তো কর্তাতেই থাকে। তাহলে মুক্তি কেমন করে হবে ?

উত্তর—যদিও সাধকের পক্ষে মুক্তির ইচ্ছা করা ভাল তথাপি বাস্তব হলো এই যে মুক্তির ইচ্ছা করলে ক্রিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়, যার ফলে সাধনাও করণ-সাপেক্ষ হয়ে পড়ে । তাৎপর্য হলো, সাধকেরা যেন অন্যান্য ইচ্ছা দূর করবার জন্যই মুক্তির ইচ্ছা করেন। কেননা অন্যান্য ইচ্ছা না থাকলে মুক্তির ইচ্ছারও প্রয়োজন হয় না। তার কারণ মুক্তি নিত্য এবং স্বতঃসিদ্ধ। সব কিছু বদলায়, কিন্তু সত্তা যেমনকার তেমন থাকে। এজন্য মুক্তি হয় না, বরং মুক্তি আছে। কেবল বন্ধনের স্বীকৃতি দূর হয়ে যায়। যদি মনে করেন যে মুক্তি যথাবৎ নেই, পরে হয় তাহলে আবার বন্ধনও হয়ে যেতে পারে॥২৬৫॥

প্রশ্ন—অধিক ধনী, অধিক বিদ্বান, অধিক দরিদ্র এবং অধিক রোগী — এদের কল্যাণ হওয়া কঠিন কেন ?

[১]মুক্তিতে হয় সম্বন্ধ বিচ্ছেদ, কিন্তু প্রেমে হয় প্রাপ্তি।

উত্তর—অধিক ধনীর ধনের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি থাকে, অধিক বিদ্বানের বিদ্যার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি থাকে, অধিক দরিদ্রের ধনের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি থাকে এবং অধিক রোগীর শরীরের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি থাকে। এই আসক্তিই তাদের মুক্তির বাধা। আসক্তি অধিক হওয়ার কারণে এরা তাড়াতাড়ি আধ্যাত্মিক পথে নিযুক্ত হতে পারে না। যদি আসক্তি না থাকে তাহলে এদেরও মুক্তি হতে পারে॥২৬৬॥

প্রশ্ন—পিতামহ ভীষ্ম জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। তাহলেও তিনি শরীর ত্যাগ করে আজানদেবতাদের লোক[১]—বসুলোকে কেন গিয়েছিলেন?

উত্তর—তিনি আগে আজানদেবতা (বসু)-ই ছিলেন আর অভিশাপের কারণে পৃথিবীতে এসেছিলেন। এজন্য শরীর ত্যাগ করে তিনি সেখানেই ফিরে গিয়েছিলেন যেখান থেকে তিনি এসেছিলেন। হ্যাঁ, আজানদেবতার সময়কাল পূর্ণ হয়ে যাবার পর তিনি মুক্ত হয়ে যাবেন॥২৬৭॥

প্রশ্ন—নির্গুণকে যাঁরা মানেন তাঁদের 'মুক্তি' এবং যাঁরা সগুণকে মানেন তাঁদের 'সাযুজ্য' লাভ—দুটির মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

উত্তর—সাযুজ্যে সমগ্রকে অর্থাৎ ঐশ্বর্যসহ সগুণ পরমাত্মাকে পাওয়া যায়। মুক্তিতে নির্গুণ ব্রহ্মের প্রাপ্তি ঘটে, যা হলো সমগ্রেরই ঐশ্বর্য॥২৬৮॥

প্রশ্ন—ভক্ত কি সালোক্যের পরে ক্রমশ সার্ষ্টি, সামীপ্য এবং সারূপ্য কে লাভ করার পর সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন?

উত্তর—এটি নির্ভর করে ভক্তের ভাবের উপর। ভক্তের যদি সেরূপ ভাব থাকে তাহলে তিনি অনন্তকাল সালোক্যে থাকতে পারেন। সেখানে সন্তুষ্টি না হলে ভগবান সার্ষ্টি প্রভৃতি অন্য কোনও স্বরূপ প্রদান করতে পারেন।

গীতা অনুসারে সালোক্যাদি পাঁচ প্রকারের মুক্তি 'সাধর্ম্য'-এর অন্তর্গত—**'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'** (১৪।২)। যদিও সাধর্ম্যের কথা ভক্তির অন্তর্গত হওয়া উচিত তবু ভগবান একে জ্ঞানে উল্লেখ করেছেন। এর তাৎপর্য হলো

---

[১]যাঁরা কল্পের প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত দেবলোকে অবস্থান করেন তাদের বলা হয় আজানদেবতা। এবং যাঁরা পূণ্যের ফলে দেবতা হয়ে পূণ্য ফল ভোগ করে পুনরায় মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন তাদের বলা হয় 'মর্ত্য' দেবতা।

পরমাত্মতত্ত্ব একই। কেবল প্রেমের রসাস্বাদনের জন্য তা দুই রূপে বিভক্ত হয় ॥২৬৯॥

প্রশ্ন—মোক্ষশাস্ত্রকে ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন মানা হয়েছে ? ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা কি কল্যাণ হয় না ?

উত্তর—নিষ্কামভাবের জন্য মোক্ষশাস্ত্রকে ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানা হয়েছে। ধর্মের দ্বারা তখনই কল্যাণ হয় যখন নিষ্কামভাবে সেটি পালন করা হয়। তাৎপর্য হলো কল্যাণ ধর্মের দ্বারা হয় না, বরং নিষ্কামভাবের দ্বারাই হয়ে থাকে ।।২৭০॥

প্রশ্ন—কোনো কোনো মানুষ মুক্তির নিন্দা করেন এবং রাধাকৃষ্ণের নিত্য বিহারকেই মানব জীবনের পূর্ণতা বলে মনে করেন। এটি কি ঠিক ?

উত্তর—তাঁরা মুক্তি কী তাই বোঝেন না। মুক্তি কোনো জানোয়ারের নাম নয়। জড়ত্বের থেকে সম্পূর্ণ সম্বন্ধ-বিচ্ছেদকে মুক্তি বলা হয়। জড়ত্ব থেকে সম্পূর্ণ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে তারপরই রাধাকৃষ্ণের নিত্যবিহারে প্রবেশ, গোপীভাবের প্রাপ্তি অথবা পরম প্রেমের প্রাপ্তি হয়ে থাকে॥২৭১॥

প্রশ্ন—সালোক্যাদি মুক্তির পরেও কি জীবকে সংসারে ফিরে আসতে হয় ?

উত্তর—সালোক্য, সামীপ্য প্রভৃতি লাভ হওয়ার পর জীবের পুনরাগমন হয় না, এই জন্যই তার সজ্ঞা হলো 'মুক্তি'। সালোক্যাদি লাভে পূর্ণতা আছে। যদি কোনো জীব সেখান থেকে ফিরে আসেন তাহলে তিনি কর্মের বশ হয়ে আসেন না। বস্তুত ভগবানের ইচ্ছায় কারক-পুরুষরূপে অবতারত্ব গ্রহণ করেন॥২৭২॥

~~○~~

মৃত্যু

প্রশ্ন—মৃত্যুর সময় যেমন নির্দিষ্ট, মৃত্যুর সময়ে যে কষ্ট ভোগ তাও কি নির্দিষ্ট ?

উত্তর—না। সকলেই নিজেদের পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করে থাকে।

পাপের লঘু-গুরু অনুসারে কষ্ট ভোগ হয়ে থাকে। কিন্তু কষ্ট ভোগের জন্য দুঃখ তাদেরই হয় যাদের অন্তরে বাঁচবার ইচ্ছা থাকে ॥২৭৩॥

প্রশ্ন—জীবনে যাঁরা পুণ্যাত্মা, সাধন-ভজন যাঁরা করেন, তাঁরাও তো অন্তিম সময়ে কষ্ট পান। তার কারণ কী ?

উত্তর—ভগবান তাঁদের পূর্বজন্মের সকল পাপ নষ্ট করে শুদ্ধ করতে চান, যাতে তাঁদের মুক্তি লাভ হয়॥২৭৪॥

প্রশ্ন—শাস্ত্রে আছে যে মৃত্যুর সময় মানুষের হাজার হাজার বিছে কামড়াবার সমান কষ্ট হয়। কিন্তু সন্তবাণীতে আছে যে মৃত্যু থেকে কষ্ট হয় না, বাঁচবার ইচ্ছা থেকেই কষ্ট হয়। বাস্তবে কোন্ কথাটি ঠিক ?

উত্তর—যেমন শৈশব থেকে যুবা এবং যুবা থেকে বৃদ্ধ হতে কোনো কষ্ট হয় না তেমনই মৃত্যুর সময়েও বাস্তবে কোনো কষ্ট হয় না।[১] কষ্ট তাদেরই হয় যাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকে। তাৎপর্য হলো এই যে, যাদের শরীরের প্রতি মোহ আছে, তাদেরই মৃত্যুর সময় শত সহস্র বৃশ্চিক দংশনের মতো কষ্ট হয়। শরীরের প্রতি যত মোহ, আসক্তি, মমতা হবে তথা বাঁচবার ইচ্ছা যত বেশি হবে শরীর ত্যাগের সময় তত বেশি দুঃখ হবে॥২৭৫॥

প্রশ্ন—কারও মৃত্যুতে এখানে যত শোক করা হয় বিদেশে তত শোক করা হয় না, তাহলে এখানকার লোকেদের মোহ কি বেশি ?

উত্তর—এমন কথা বলা যায় না। যেখানে ব্যক্তিগত মোহ বেশি সেখানে শোকের গভীরতা কম হয়। ব্যক্তিগত মোহে অজ্ঞতা, মূঢ়তা বেশি হয়ে থাকে।

---

[১] দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ (গীতা ২।১৩)

'দেহধারীর এই মনুষ্য-শরীরে যেমন শৈশবাবস্থা, যৌবনাবস্থা এবং বৃদ্ধাবস্থা হয় তেমনই অন্য শরীরও প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে ধীর মানুষেরা মোহিত হন না।'

রাম চরন দৃঢ় প্রীতি করি বালি কীন্হ তনু ত্যাগ।
সুমন মাল জিমি কন্ঠ তে গিরত ন জানই নাগ ॥

(শ্রীরামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১০)

ব্যক্তিগত মোহ হলো পশুত্ব। বাঁদরীর নিজের বাচ্চাদের প্রতি এত মোহ থাকে যে মৃত বাচ্চাকেও সে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। কিন্তু খাবার সময় যদি বাচ্চা পাশে আসে তো এমন খিঁচিয়ে ওঠে যে বাচ্চা চিঁ চিঁ করতে করতে পালিয়ে যায়।

অপরের মৃত্যুতে শোক না হওয়ার কারণ হলো সংকীর্ণ ব্যক্তি-ভাবনা। এর ফলে অধঃপতন ঘটে থাকে। ব্যাপক মোহ বা বহুতর আকর্ষণ দূর হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংকীর্ণতা দূর হওয়া কঠিন । ব্যক্তিগত মোহ দৃঢ় হয়ে থাকে—**'জিমি অবিবেকী পুরুষ সরীরহি'** (শ্রীরামচরিতমানস, অযোধ্যাকাণ্ড ১৪২।১) মোহ যেমন যেমন দূর হয় মানুষের অবস্থাভেদও তেমন তেমন বিস্তৃত হতে থাকে ।[১]

তাৎপর্য হলো মোহ যত ব্যাপক হয় ততই তা কমতে থাকে। যেমন, প্রথমে নিজের শরীরের প্রতি মোহ ছিল, তারপর আত্মীয়স্বজনের প্রতি মোহ হলো, এর পর ক্রমশ জাতি, মহল্লা, গ্রাম, প্রদেশ, দেশের প্রতি মোহ জন্মাল এবং তখন মোহ বিস্তৃত হলো প্রত্যেক মানুষ এবং তারপর প্রত্যেকটি জীবের প্রতি। অন্তিমে কারও প্রতি মোহ থাকে না। এটি এক সিদ্ধান্ত যে, কারও প্রতি মোহ না থাকার অর্থ সকলের প্রতি মোহ এবং সকলের প্রতি মোহের অর্থ নির্দিষ্ট কারও প্রতি মোহ না থাকা। ব্যাপক মোহ বাস্তবে মোহ নয়, তা হলো আত্মীয়তা॥২৭৬॥

প্রশ্ন—শাস্ত্রে আছে যে ধর্মরাজের কাছে যেতে মৃত-আত্মার এক বছর সময় লাগে। একি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ?

উত্তর—এটি সকলের জন্য নয়, এটি যারা পাপী তাদের জন্য। তাদের পক্ষে ধর্মরাজের কাছে যাওয়ার পথও বড় কষ্টদায়ক। মৃত্যুর পর নিজের নিজের কর্মানুসারে গতি হয়। ভগবানের ভক্ত ধর্মরাজের কাছে যান না॥২৭৭॥

প্রশ্ন—অন্তিম সময়ে যদি ভগবানের বা সংসারের কারোরই চিন্তা না হয় তাহলে কী গতি হবে ?

---

[১]অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥ (পঞ্চতন্ত্র, অপরীক্ষিত, ৩৮)
'এ আপন এবং এ পর —এই রকম চিন্তা সঙ্কীর্ণ মনের মানুষেরা করে থাকেন। উদার ভাবনার ব্যক্তিদের কাছে সমগ্র বিশ্বই নিজেদের আত্মীয়ের মতো।'

উত্তর—এমন সম্ভব নয়। কোনো না কোনো চিন্তা থাকবেই— **'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু নিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ'** (গীতা ৩।৫)॥২৭৮॥

প্রশ্ন—অন্তিম সময়ে যাতে ভগবানের স্মরণ হয় তার জন্য কী করতে হবে ?

উত্তর—সব সময়েই ভগবানকে স্মরণ করুন, কেননা প্রত্যেকটি সময়ই হলো অন্তিম কাল, কখন মৃত্যু হবে তা কে বলতে পারে ? এইজন্য ভগবান গীতাতে বলেছেন—**'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর'** (৮।৭) 'এজন্য তুমি সব সময়ে আমাকে স্মরণ করো এবং যুদ্ধও করো।' ॥২৭৯॥

প্রশ্ন—মানুষ যেসব কথা চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করে সেই জিনিষই সে লাভ করে— এই নিয়ম কি যে আত্মহত্যা করে তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ?

উত্তর—হ্যাঁ, তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু তার পক্ষে ভগবানের চিন্তা (শুভ চিন্তা) করা খুব কঠিন। কেননা সে দুঃখ নিয়ে আত্মহত্যা করে এবং তার উদ্দেশ্য থাকে সুখের। দ্বিতীয় কথা, প্রাণ বার হওয়ার সময় তার নিজের কৃত-কর্মের জন্য অনুশোচনা হয়, কিন্তু তখন সে কিছু করতে পারে না। তৃতীয় কথা, প্রাণ বার হওয়ার সময় তার তীব্র কষ্ট অনুভব হয় । চতুর্থ কথা, যদি তার ভাব শুদ্ধ হয়, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস থাকে, সে ভগবানের চিন্তা করতে চায় তা হলে সে আত্মহত্যার মতো মহাপাপ কেন করবে ? বুদ্ধি অশুদ্ধ হলেই মানুষ আত্মহত্যা করে। এজন্য যে আত্মহত্যা করে তার দুর্গতি হয়[১]॥২৮০॥

~~O~~

[১]অন্ধং তমো বিশেযুস্তে যে চৈবাত্মহনো জনাঃ।
ভুক্ত্বা নিরয়সাহস্রং তে চ স্যুর্গ্রামসূকরাঃ॥
আত্মঘাতো ন কর্তব্যস্তস্মাৎ ক্বাপি বিপশ্চিতা।
ইহাপি চ পরত্রাপি ন শুভান্যাত্মঘাতিনাম্॥ (স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড ১২।১৩)

'আত্মঘাতী লোকেরা ঘোর নরকে যায় এবং সহস্রাধিক নরক যন্ত্রণা ভোগ করে আবার গ্রামের শূকরের যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এজন্য বুদ্ধিমান মানুষদের ভুল করেও কখনো আত্মহত্যা করা উচিত নয়। আত্মঘাতীদের এই লোকে এবং পরলোকেও মঙ্গল হয় না।'

বাসুদেবঃ সর্বম্

প্রশ্ন—গোপিকারা সর্বত্রই কেবল কৃষ্ণকেই দর্শন করতেন কী প্রকারে? এটি কি গীতার 'বাসুদেবঃ সর্বম্' ?

উত্তর—গীতার **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**-এ সর্বত্র ভগবানকে তত্ত্বরূপে দেখা হয় কিন্তু গোপিকাদের সব জায়গায় ভগবানকে দেখা হলো দৃষ্টি দিয়ে দেখা। গোপিকাদের চোখের মণিতে ভগবান কৃষ্ণের চিত্র স্থায়ী হয়ে গিয়েছে, এজন্য সর্বত্র তাদের কৃষ্ণই দর্শন হয়। যেমন, কেউ লাল চশমা পরলে সব কিছুই লাল দেখে তেমনই গোপিকারাও সব জায়গায় কেবল কৃষ্ণকেই দেখতেন॥২৮১॥

প্রশ্ন—যখন সব কিছুই পরমাত্মা—'বাসুদেবঃ সর্বম্' তাহলে জড়তা কিসে আছে ?

উত্তর—জড়তা জীবের দৃষ্টিতে আছে—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। জড়ত্বের কারণ হলো— অজ্ঞান॥২৮২॥

প্রশ্ন—আসক্তি ত্যাগ করলে 'বাসুদেবঃ সর্বম্'-এর অনুভূতি হবে নাকি অনুভূতি হওয়ার পর আসক্তি দূর হবে ?

উত্তর—আসক্তি ত্যাগ করাও সাধনা এবং সব কিছুর মধ্যে ভগবানকে দেখাও সাধনা। কর্মযোগী আসক্তি ত্যাগ করে এবং ভক্তিযোগী সব কিছুর মধ্যে পরমাত্মাকে দেখে। একটি সিদ্ধ হলে দুটিরই সিদ্ধি হয়ে যায়॥২৮৩॥

প্রশ্ন—আমাদের আসক্তির ফলে চেতন-পদার্থে ঈশ্বরের স্বরূপ অনুভব হয় না। তাহলে যাতে আমাদের আসক্তি নেই সেগুলিতে ঈশ্বরস্বরূপ বোধ হয় না কেন ?

উত্তর—যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে আসক্তি থাকে, রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ থাকে ততক্ষণ বস্তুকে বস্তুই দেখা যাবে। যখন অন্তরে সমভাব আসবে তখন **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** দৃষ্ট হবে।

আসক্তি মূলত নিজের মধ্যে থাকে, প্রাণী-পদার্থে থাকে না। গীতা পাঁচটি স্থানে আসক্তি থাকার কথা বলেছে—পদার্থ (৩। ৩৪), ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি (৩।৪০) এবং অহম্ (২।৫৯)। বাস্তবে আসক্তি নিজের মধ্যেই (অহং-এ)

থাকে। কিন্তু তা পাঁচটি স্থানে দৃষ্ট হয়। নিজের আসক্তিই প্রাণী-পদার্থে অনুভূত হয়। যখন নিজের মধ্যে আসক্তি থাকবে না তখন সর্বত্র ভগবানকেই দেখা যাবে।।২৮৪।।

প্রশ্ন—সংসার বিকারযুক্ত, নাকি ভগবানের স্বরূপ ?

উত্তর—রাগ (আসক্তি)-দ্বেষের কারণে সংসার বিকারযুক্ত মনে হয় । যদি রাগ-দ্বেষ না থাকে তাহলে তা ভগবৎস্বরূপই হয়ে যায়। আসক্তি দূর করবার জন্যই সংসারকে বিকারশীল বলা হয়েছে।।২৮৫।।

প্রশ্ন—বুদ্ধিতে জড়ত্ব আছে, না হলে সমগ্র সংসার হলো চিন্ময়— কথা যদি তাই হয় তাহলে ভগবানের ধামের সঙ্গে সংসারের প্রভেদ কোথায় ?

উত্তর—রামায়ণে যেমন বলা হয়েছে—**'সাতবঁ সম মোহি ময় জগ দেখা। মোতেঁ সন্ত অধিক করি লেখা।।'** (অরণ্যকাণ্ড ৩৬।২)— সংসার এই রকমই চিন্ময়, কিন্তু ভগবান তারও অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থাৎ চিন্ময়তারও সার তিনি, সেজন্য তাঁকে **'আনন্দকন্দ'**ও বলা হয়েছে।।২৮৬।।

প্রশ্ন—'বাসুদেবঃ সর্বম্' -এর বিষয়ে দু ধরনের কথা শোনা যায়— এক হলো, ভগবান আমাদের সামনে যে রূপে এসেছেন সেই রূপ অনুসারে তাঁর সঙ্গে আচরণ করা আর দ্বিতীয়, ভগবান যে রূপেই আসুন না কেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভগবানের মতো আচরণ করা, যেমন ভক্তিমতি মীরা সিংহের আরতি করেছিলেন, কুকুর রুটি মুখে করে পালালে নামদেব তার পিছনে ঘি নিয়ে দৌড়েছিলেন প্রভৃতি। আমরা কোন্ কথাটি মানব ?

উত্তর—মীরা, নামদেব প্রভৃতির মতো আচরণ করা হলো সিদ্ধাবস্থার কথা, সাধকদের অবস্থাভেদ বিচার করে যথাযোগ্য আচরণ করা উচিত। তাঁদের উচিত বাইরে যথাযোগ্য আচরণ বজায় রেখে হৃদয়ে কাউকে হীন মনে না করা, কাউকে অপমান-নিন্দা না করা।।২৮৭।।

প্রশ্ন—সংসারে তো নিরন্তর পরিবর্তন হতে থাকে, তাহলে তা পরমাত্মার স্বরূপ কেমন করে হলো ?

উত্তর—যেমন গিরগিটি (বহুরূপী) নানা রকম রং বদলালেও গিরগিটিই থেকে যায় আর রংগুলি হয় বহুরূপীর। রংকে সে আলাদা করতে পারে না।

তেমনই প্রকৃতি হলো ভগবানের শক্তি আর শক্তিকে শক্তিমানের কাছে থেকে আলাদা করা যায় না।

যেমন সমুদ্রের উপর স্থরে তরঙ্গের প্রবাহ দেখা যায়, কিন্তু ভিতরে সমুদ্র থাকে স্থির এবং শান্ত। সমুদ্রের ভিতরে কোনো তরঙ্গ নেই। অনুরূপভাবে সংসারও পরমাত্মার তরঙ্গ। অতএব পরিবর্তনও পরমাত্মার স্বরূপ এবং অপরিবর্তনও পরমাত্মার স্বরূপ— **'সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)॥২৮৮॥

প্রশ্ন—শক্তি (প্রকৃতি) তো শক্তিমান (ভগবান)-এর অধীন। তাহলে তা ভগবানের স্বরূপ কেমন করে হলো ?

উত্তর—শক্তি শক্তিমান থেকে ভিন্ন নয় যেমন নখ, চুল প্রভৃতি নিষ্প্রাণ বস্তুগুলিও আমাদের থেকে আলাদা নয়, বরং সেগুলি আমাদের দেহেরই অভিন্ন অংশ। অতএব পরমাত্মা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নেই॥২৮৯॥

প্রশ্ন—সমগ্র সংসার যখন ভগবৎস্বরূপ তখন অন্যদের আবার উপদেশ কেন দেওয়া হয় ?

উত্তর—নিজের যেমন ভুল হতে পারে তেমনই অন্যদেরও ভুল হতে পারে এইভাবে নিজের মনে করেই অন্যদের উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন নিজের মধ্যে দুর্বলতা দেখলে তার সংশোধন করা হয় তেমনই অন্যের দুর্বলতাকেও নিজের মনে করে সেটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে উপদেশ দেওয়া হয়। অতএব বাস্তবে উপদেশ নিজেকেই দেওয়া হয়— **'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'** (গীতা ৬।৫)। অন্যকে উপদেশ তার দৃষ্টিতে দেওয়া হয়, কেননা সে আমাদের কাছ থেকে উপদেশ চায়।

আসক্তিকে দুভাবে দূর করা যায়— বিচারের দ্বারা অথবা কর্মের দ্বারা। যদি আমাদের কামনা হয় উপদেশ দেওয়ার, বক্তৃতা দেওয়ার তাহলে সেই বাসনাকে চরিতার্থ করবার জন্য ভগবান আমাদের সামনে অজ্ঞানী হয়ে, শ্রোতা হয়ে উপস্থিত হয়েছেন এরূপ মনে করবেন। যদি রাজা হয়ে শাসন করবার বাসনা থাকে তাহলে ভগবান প্রজারূপে এসেছেন, এরূপ চিন্তা রাখবেন॥২৯০॥

প্রশ্ন—সাম্য-ভাব এবং 'বাসুদেবঃ সর্বম্'— দুটির মধ্যে প্রভেদ কোথায় ?

উত্তর—সাম্য ভাবের মধ্যে নিজের ভাবের সংস্কার (সূক্ষ্ম অহম্) থাকে, কিন্তু **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**-এ কোনো মতভেদ থাকে না, কেননা এতে সকল মত বা ভাব-ই বাসুদেব। সমত্ব-ভাবনায় তো স্বরূপের প্রাধান্য, কিন্তু 'বাসুদেবঃ সর্বম্'-এ ভগবানের প্রাধান্য॥২৯১॥

প্রশ্ন—এই কথা বলা হয়ে থাকে যে সংসারও (জড়) পরমাত্মার স্বরূপ। আবার এই কথাও বলা হয় যে সংসারের অস্তিত্ব কেবল আমাদের দৃষ্টিতে। বাস্তবে জড় বলে কিছু নেই, চৈতন্য রূপে কেবল এক পরমাত্মাই আছেন। দুটির মধ্যে কোন্ কথাটি মানব ?

উত্তর—যত দিন পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিতে সংসারের সত্তা আছে তত দিন এটি মেনে নিতে হবে যে সংসার হলো পরমাত্মার স্বরূপ। যদি আমরা সংসারের সত্তাকে না মানি তাহলে এক পরমাত্মা ছাড়া আর কিছু নেই।

সংসাররূপেও তিনি এবং সত্তারূপেও তিনি। কেননা বাস্তবে সংসারই নেই। সৎ-এর মধ্যেই অ-সতের আভাস পাওয়া যায়। সৎ ছাড়া অ-সতের আভাস হয়ই না। জ্ঞানী এবং পরমাত্মার দৃষ্টিতে সংসার বলে কিছু নেই। সংসার তো জীবের দৃষ্টিতে রয়েছে। তার কারণ সংসারের স্বতন্ত্র সত্তাই নেই॥২৯২॥

প্রশ্ন—সংসারকে না দেখে কেবল পরমাত্মাকে দেখব কেমন করে ?

উত্তর—সংসার যদি দৃষ্ট হতে থাকে তো হোক, আপত্তি কিসের ? দৃষ্টি হলো সীমিত কিন্তু তত্ত্ব অসীম। সূর্যকে থালার মতো দেখায়। তাহলে সূর্য কি থালার মতো ? দেখা ব্যক্তিগত ব্যাপার। যা ব্যক্তিগত তা সিদ্ধান্ত নয়। যা দৃষ্ট হয় তা এবং যে দেখে— সবই বিলীন হয়ে যাবে এবং পরমাত্মতত্ত্ব অবশিষ্ট থাকবে। পরিলক্ষিত হওয়া এবং দেখা সেই তত্ত্বের অন্তর্গত । সেজন্য পরিলক্ষিত দৃশ্যের এবং দেখার আগ্রহ থাকা উচিত নয়॥২৯৩॥

প্রশ্ন—সংসারকে ভগবানের আদি অবতার বলা হয়েছে 'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য' (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৬।৪১), তাহলে সংসার অসত্য হলো কী করে ?

উত্তর—ভগবানের অবতার সত্য, সংসার সত্য নয়॥২৯৪॥

প্রশ্ন—সকল ভক্তের কি শেষ পর্যন্ত '*বাসুদেবঃ সর্বম্*' (সব কিছুই ভগবান)-এর অনুভূতি হয় ?

উত্তর—সকলের হয় না। বরং অনুভূতি তারই হয় যার মধ্যে নিজের মত (ভক্তি)-এর আগ্রহ নেই, নিজের ধারণাকে যে সর্বশেষ বলে মানে না। যদি সে জ্ঞানকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে তাহলে তার **'বাসুদেবঃ সর্বম্'**- এর অনুভূতি হয় না॥২৯৫॥

প্রশ্ন—'*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩।১৪।১) এবং '*বাসুদেবঃ সর্বম্*' (গীতা ৭।১৯)—দুটির মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

উত্তর—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-এতে নির্গুণের প্রাধান্য আছে এবং অ-সতের সত্তা মানা হয় না। কিন্তু 'বাসুদেব সর্বম্'-এ সগুণের প্রাধান্য আছে এবং অ-সতের নিষেধ নেই।

সগুণের মধ্যে তো নির্গুণ থাকতে পারে কিন্তু নির্গুণে সগুণ আসতে পারে না। নির্গুণে গুণ স্বীকার করা হয় না। তাই গুণ আসবে কী করে ? সগুণ হলো সব গুণের আশ্রয়দাতা, কিন্তু তা কোনো গুণের আশ্রিত বা কোনো গুণের দ্বারা আবদ্ধ নয়। ভগবানও সগুণকে 'সমগ্র' বলেছেন— **'অসংশয়ং সমগ্রং মাম্'** (গীতা ৭।১) সমগ্রে সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, জড়-চেতন, সৎ-অসৎ প্রভৃতি সব কিছুই বর্তমান ॥২৯৬॥

প্রশ্ন—একটি কথা হলো 'সব কিছু ভগবান' এবং আর একটি কথা হলো 'আমরা ভগবানের, ভগবান আমাদের'। দুটির মধ্যে আমরা কোন্ কথাটিকে মানব ?

উত্তর—প্রথমে এইটি মেনে নাও যে 'আমরা ভগবানের এবং ভগবান আমাদের'। এই কথাটি মেনে নিলে এটি অনুভূত হবে যে 'আমি নই, ভগবানই আছেন'॥২৯৭॥

প্রশ্ন—বিভিন্ন ভাবের সমন্বয় রয়েছে 'আছে'-র মধ্যে, নাকি 'নেই'-এর মধ্যে ?

উত্তর—একের মধ্যেই সব কিছুরই সমন্বয় অর্থাৎ 'আছে'-র মধ্যেই

সমস্তেরই সমন্বয় রয়েছে। 'আছে' ছাড়া আর কারও স্বতন্ত্র সত্তা নেই। 'আছে'-র মধ্যে বিভিন্নতার নিষেধ নেই। কিন্তু সেগুলির স্বতন্ত্র সত্তার নিষেধ আছে॥ ২৯৮॥

~~O~~

বিবেক

প্রশ্ন—কোন্ উপায়ে বিবেক উৎকর্ষ লাভ করে ?

উত্তর—মানুষ যদি বিবেককে শ্রদ্ধা করে অর্থাৎ বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ যদি না করে তাহলে তার বিবেক, গুরু প্রভৃতির সহায়তা ছাড়াই বিকশিত হয়ে থাকে। লোকে যদি জেনেশুনে অনুচিত কাজ করে তাহলে বিবেকের বিকাশ হবে না॥২৯৯॥

প্রশ্ন—বিবেকের প্রয়োজন কতদূর ?

উত্তর—জড় পদার্থের সংযোগে পেতে থাকা সুখকে ত্যাগ করা পর্যন্ত। তাৎপর্য হলো বিনাশশীল বস্তুর প্রতি যে আকর্ষণ তা দূর করবার জন্যই বিবেকের প্রয়োজন। এজন্য বিবেক থেকে বৈরাগ্য হয়। বিবেক-পথ থেকে যদি একচুলও সরে না যাই তাহলে জড়ের আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হবে ॥৩০০॥

প্রশ্ন—বিচার এবং বিবেকের মধ্যে প্রভেদ কোথায় ?

উত্তর—বিচারের মধ্যে এইভাবে চিন্তার মন্থন হয় যে এটি নিত্য কেমন করে, ঐটি অনিত্য কেমন করে ? প্রভৃতি। কিন্তু বিবেকে নিত্য-অনিত্য বস্তুগুলির বিশ্লেষণ হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিবেক দৃঢ় হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে বিচার থাকে। বিবেক স্থিরতা লাভ করলে আর বিচার থাকে না, কেবল বিবেকই থাকে ॥৩০১॥

~~O~~

সঙ্কল্প

প্রশ্ন—সঙ্কল্প না করলে যে কোনো কাজ কী করে করা যাবে ?

উত্তর—বাস্তবে কাজ করবার জন্য প্রেরণা অথবা বাসনা হয়ে থাকে,

সঙ্কল্প হয় না। যখন নিজের আসক্তি, মমতা এবং আগ্রহ যুক্ত হয় তখন হয় সঙ্কল্প। কাজ করবার জন্য প্রেরণা এবং বিচার বন্ধনকারী হয় না, কিন্তু সঙ্কল্প বন্ধনকারী॥৩০২॥

প্রশ্ন—ভগবানও যখন সঙ্কল্প করেন তখনই সৃষ্টির উদ্ভব হয়, তাহলে কি এই সঙ্কল্প বন্ধনকারী নয় ?

উত্তর—ভগবানের সঙ্কল্পে আসক্তি ও আগ্রহ থাকে না, নিজের জন্য কিছু পাওয়ারও ইচ্ছা থাকে না। সেজন্য বাস্তবে তা সঙ্কল্প নয়, তা হলো প্রেরণা। প্রেরণাকেই সঙ্কল্প নামে বলা হয়েছে॥৩০৩॥

প্রশ্ন—ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতিতে হয়ে থাকে, কিন্তু কিছু ক্রিয়া আমরা সঙ্কল্পযুক্ত হয়ে করি। যেমন, খাদ্য নিজে থেকে হজম হয়, কিন্তু আমরা ভোজন করবার সঙ্কল্প করি বলেই খাই। এই সঙ্কল্প তো আমরাই করি ?

উত্তর—বাস্তবে সঙ্কল্পও প্রকৃতিতে হয়, স্বয়ং-এ (জীবাত্মায়) নয়। সঙ্কল্পের আধার হলো অজ্ঞান, অবিবেক। বিবেক পরিশুদ্ধ না হওয়ায় মানুষ নিজে থেকে সঙ্কল্প করে, নিজেকে কর্তা মনে করে। সঙ্কল্প থেকে কামনার সৃষ্টি হয়। মন-বুদ্ধির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নিলে নিজের মধ্যে সঙ্কল্প-বিকল্প দৃষ্ট হয়।

ক্ষুধা প্রাণের ধর্ম, স্বয়ং-এর নয়। প্রাণের সঙ্গে একাত্মতা বোধের জন্য মনে হয় যে আমার ক্ষুধা পেয়েছে এবং 'আমি ভোজন করব' — এইরকম সঙ্কল্প হয়ে থাকে। ভোজন প্রাণকে পোষণ করবার জন্য, স্বয়ং-কে পোষণ করবার জন্য নয়। যদি প্রাণের সঙ্গে তাদাত্ম (একাত্ম-ভাব) না করেন তাহলে প্রেরণা হবে, সঙ্কল্প হবে না॥৩০৪॥

প্রশ্ন—সন্তদের কথায় আছে যে ভগবান সত্য সঙ্কল্পকে পূর্ণ করেন, এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—সত্য-তত্ত্ব (পরমাত্মা) কে প্রাপ্তির সঙ্কল্পই হলো যথার্থ সঙ্কল্প। ভগবান এটি পূর্ণ করেন। অ-সৎ (সংসার)-এর সঙ্কল্প প্রারব্ধের (ভাগ্যের) কারণে পূর্ণ অথবা অপূর্ণ হয়॥৩০৫॥

~~০~~

সন্ত-মহাত্মা (দেখুন—জীবন্মুক্ত)

প্রশ্ন—সাধু, সন্ত এবং মহাত্মা, এঁদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

উত্তর—যিনি অধ্যাত্ম সাধনায় তৎপর তিনি 'সাধু'। সাধনা করে যাঁর অনুভূতি হয়েছে এবং যাঁর বাণী, আচরণ প্রভৃতি সকল কিছুতে সৎ-তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয় তিনি হলেন 'সন্ত'। যাঁর দৃষ্টিতে আমি-আমার, তুমি-তোমার ভেদ নেই, যাঁর সকল প্রাণীর প্রতি সমান ভাব হয়েছে তিনি 'মহাত্মা'।

গৃহস্থ, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকল বর্ণ, আশ্রম, দেশ, বেশ প্রভৃতির মানুষ সাধু, সন্ত এবং মহাত্মা হতে পারেন। সাধু, সন্ত, মহাত্মা সাধারণতঃ গেরুয়াবস্ত্র ধারণ করেন, সেজন্য লোকেরা এই বেশধারীকেও সাধু, সন্ত, মহাত্মা বলে থাকেন ॥৩০৬॥

প্রশ্ন—মানুষ শরীর ত্যাগ করার পরেই সর্বব্যাপী হয়, নাকি তার আগে হয় ?

উত্তর—মানুষ তো মুক্ত হয়ে গেলেই সর্বব্যাপী হয়ে যায়। কেবল লোকের দৃষ্টিতে দেহের আবরণ দৃষ্ট হয় ॥৩০৭॥

প্রশ্ন—তাহলে তাঁর প্রচার শরীর চলে যাবার পরই বেশি হয় কেন ?

উত্তর—শরীর থাকতে তাঁকে একজন ব্যক্তি বলে মনে হয়। কিন্তু শরীর চলে যাবার পর তাঁর উপদেশকে একজন ব্যক্তির মত বলে মনে না হয়ে তা সিদ্ধান্ত রূপে প্রকট হয়। লোকের মধ্যে মতের চেয়ে সিদ্ধান্তের প্রচার বেশি হয়। মত হয় ব্যক্তিকে নিয়ে, আর সিদ্ধান্ত হয় তত্ত্বকে নিয়ে॥৩০৮॥

প্রশ্ন—সন্ত-মহাত্মাকে যদি কোনো আদেশ দেওয়া হয় তবে তা স্বপ্নের মধ্যে কেন দেওয়া হয় ?

উত্তর—জাগরণ অবস্থায় যদি আদেশ দেন এবং তা যদি তাঁরা না মানেন তবে তাতে পাপ হবে। স্বপ্নাদেশ যদি মানা না হয় তাহলে পাপ হবে না এবং মানলে তো লাভই হবে॥৩০৯॥

প্রশ্ন—ভগবানের লীলা দেখে যে ভ্রান্তি হয় তা লীলার শ্রবণে দূর হয়ে যায়। কিন্তু সন্তদের লীলা (আচরণ) দেখে যে ভ্রম হয় তা কী প্রকারে দূর হয় ?

উত্তর—সন্তদের লীলা দেখে যে ভ্রম হয় তার বিনাশের উপায় হলো—

তাদের উপদেশের দিকে মন দেওয়া, তাঁদের আচরণের দিকে মন না দেওয়া। তার কারণ তাঁদের আচরণ দেশ, কাল, পরিস্থিতি প্রভৃতি অনুসারে তথা সম্মুখস্থ ব্যক্তির ভাবানুসারে হয়ে থাকে। তাই তাঁদের সব আচরণ আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি না॥৩১০॥

প্রশ্ন—প্রচণ্ড ব্যাধিতেও সন্তগণ আনন্দে অবিচল কিভাবে থাকেন ?

উত্তর—তার কারণ, রোগভোগে পাপ কেটে যাচ্ছে—এই লাভের দিকে তাঁদের দৃষ্টি থাকে। যেমন, কাঁটা বার করবার সময় কষ্ট হলেও খারাপ লাগে না। নারী প্রসবের বেদনাকে এই ভেবে আনন্দের সঙ্গে সহ্য করেন যে তাঁর সন্তান হয়েছে॥৩১১॥

প্রশ্ন—সন্তদের রাজনীতিতে আসা উচিত কি ?

উত্তর—যদি শাসকেরা নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তাহলে সন্তদের রাজনীতিতে আসা চাই-ই। যদি স্বার্থভাব না থাকে আর কেবল পরহিতের ভাব থাকে তাহলে রাজনীতি বাধক হয় না॥৩১২॥

প্রশ্ন—সন্তদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মিলন কী করে হবে ?

উত্তর—সন্তদের সম্মিলন তখনই হবে যখন তাঁদের উদ্দেশ্য হবে এক। যদি সকলের মধ্যে একই আচরণ-বিধি আনতে চান তাহলে তা হতে পারে না। কেননা বাইরে থেকে সকলে ভিন্ন ভিন্ন বিধি পালন করেন। সেজন্য সন্তদের উচিত নিজেদের সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকা॥৩১৩॥

প্রশ্ন—সন্ত-মহাত্মাগণ যখন উপদেশ দেন তখন তাঁদের কী দৃষ্টি থাকে ?

উত্তর—লোকেদের দৃষ্টিতে তাঁরা ভগবানে নিযুক্ত করবার জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিতে এক ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'**। সাধারণ মানুষেরা যে স্থিতিতে রয়েছেন তাঁরা সেই স্থিতিতে নেমে এসে তাঁদের উপদেশ দেন॥৩১৪॥

প্রশ্ন—একটি কথা বলা হয় যে সন্তরা অপরের দুঃখে দুঃখী হন আবার অন্য একটি কথা বলা হয় যে সন্তরা বাস্তবে নিজেদের দুঃখেও দুঃখী হন না এবং অপরের দুঃখেও দুঃখিত হন না। এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যেমন সমুদ্রের উপরে তরঙ্গ ওঠে, কিন্তু সমুদ্রের ভিতরে ওঠে

না, তেমনই ব্যবহারে সন্তদের সুখী-দুঃখী হতে দেখা যায় কিন্তু তত্ত্বতঃ তাঁরা সুখীও হন না, দুঃখীও হন না। তাঁরা অন্যের দুঃখে দুঃখিত হন না, বরং তাদের দুঃখ দূর করতে সচেষ্ট হন॥৩১৫॥

প্রশ্ন—কোনো সন্তের কাছে তাঁর অনুভূতির কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত, না উচিতও নয় ?

উত্তর—পারমার্থিক বিষয়ে অনুভূতির কথা জিজ্ঞাসা করা এবং অনুভূতির কথা বলা— দুটিই উচিত নয়। লৌকিক বিষয়েও 'তোমার কাছে মোট কত টাকা আছে' এমন কথা জিজ্ঞাসা করাকে অসভ্যতা বলা হয়েছে। আমার ব্যাঙ্কে এত টাকা আছে— এই কথাও কেউ জানায় না। এটি জিজ্ঞাসার বা বলার কথা নয়। ভগবান কি অর্থের চেয়েও তুচ্ছ ?

দ্বিতীয় কথা, যে অনুভূতির বিষয়ে প্রশ্ন করে তার মধ্যে সন্তের প্রতি অশ্রদ্ধা থাকে। যদি কিছুটা অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, সন্দেহ না থাকে তাহলে সে কেন প্রশ্ন করবে ? সন্ত যদি উত্তর দেন যে তাঁর পরমাত্মার অনুভূতি হয়েছে তাহলে প্রশ্ন কর্তার মনে অশ্রদ্ধাই জেগে উঠবে। মনে হবে ইনি আত্মশ্লাঘা করছেন। যদি সন্ত বলেন যে অনুভূতি হয়নি তাহলেও অশ্রদ্ধাই হবে।[১] অতএব অনুভূতির বিষয়ে প্রশ্ন করলে প্রশ্নকর্তার ক্ষতি (অশ্রদ্ধা) হয়ে থাকে, লাভ হয় না।

তৃতীয় কথা, অভিজ্ঞ মহাপুরুষের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তিই অজ্ঞানী নয়। তাঁর দৃষ্টিতে জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ নেই। তাঁর দৃষ্টিতে জ্ঞান সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু তারা তা জানে না। 'আমিই সেই'— নিজের সত্তা সম্পর্কে সকলেরই এমন ধারণা রয়েছে। কিন্তু ভুল করে শরীর-যুক্ত হয়ে সত্তাকে মানে। বাস্তবে জ্ঞান হয় না, অজ্ঞানের নাশ হয়। জ্ঞান তো স্বতঃসিদ্ধ। এজন্য অনুভূতি লাভ

---

[১]উপনিষদে শিষ্য তাঁর গুরুকে বলছেন—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥ (কেনোপনিষদ্ ২।২)

'আমি ভালভাবেই তত্ত্বকে জেনে গেছি এমন কথা আমি মনে করি না। আবার এমন কথাও মানি না যে আমি তত্ত্বকে জানি না, কেননা আমি তা জানি। আমি তত্ত্বকে জানি অথবা জানি না, এমন সন্দেহও নেই। আমাদের মধ্যে যে কেউ সেই তত্ত্বকে জানে সেই আমার উক্ত কথার তাৎপর্য বুঝতে পারবে।'

হলে এমন কথা মনে হয় না যে প্রথমে জ্ঞান ছিল না, এখন অনুভূত হয়েছে। বরং স্বাভাবিকভাবে এইটি মনে হয় যে এটি তো আগে থেকেই ছিল, নতুন আর কী হলো ?

প্রশ্নকর্তা তো অনুভূতির কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু অভিজ্ঞ সন্ত এর কী উত্তর দেবেন ? যদি তিনি বলেন যে তাঁর অনুভূতি লাভ হয়েছে তাহলে তাতে অসত্য ভাষণের দোষ হবে। কেননা তিনি এমন কথা মনে করেন না যে তাঁর অনুভূতি হয়েছে, অন্যের হয়নি। উপনিষদে আছে যে যখন রাজা জনক বলেছিলেন যে এই এক হাজার গরু রয়েছে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি এগুলি নিয়ে যান । তখন যাজ্ঞবল্ক্য দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন এবং শিষ্যদের ঐ গরুগুলিকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। রাজা জনকের হোতা অশ্বল প্রশ্ন করেছিলেন, সকলের মধ্যে তুমিই কি ব্রহ্মজ্ঞানী ? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানীকে আমি নমস্কার করি। গরুগুলি আমার দরকার। এজন্য সেগুলি নিয়ে যাচ্ছি। তোমার মনে যদি কোনো সংশয় থাকে তাহলে প্রশ্ন কর॥৩১৬॥

প্রশ্ন—সত্যকার সন্ত কে ?

উত্তর—যিনি নিজের উদ্ধার করেছেন এবং যাঁর অপরকে উদ্ধার করা ছাড়া কোনো ইচ্ছা নেই। যাঁর মধ্যে স্বার্থের লেশমাত্রও নেই। যাঁর মধ্যে সংসারের উদ্ধার ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা নেই, যাঁর কিছুই নেওয়ার নেই॥৩১৭॥

~~০~~

সংসার (দেখুন—সুখাসক্তি)

প্রশ্ন—সূক্ষ্ম জগৎ এবং কারণ জগৎ কী ?

উত্তর—সকল প্রাণীর (সমষ্টি) সূক্ষ্ম-শরীর মিলিত হয়ে সূক্ষ্ম জগৎ এবং কারণ শরীর মিলিত হয়ে কারণ জগৎ হয়॥৩১৮॥

প্রশ্ন—সংসারের প্রভাব না পড়ে — তার জন্য কি করব ?

উত্তর—সংসারের প্রভাব মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের উপর পড়ে, নিজের উপর পড়ে না। এইদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সংসারের প্রভাব চিরকাল থাকবে

না, তা দূর হয়ে যাবে। এজন্য এর কোনো পরোয়া করবে না। আমি তা থেকে আলাদা— এইদিকে দৃষ্টি রাখলে তার মূল নষ্ট হয়ে যাবে।

আমরা পরমাত্মার অংশ। এজন্য আমাদের সম্বন্ধ পরমাত্মার সঙ্গে। সংসারে কোনো বস্তুই ব্যক্তিগত নয়। শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রকৃতির অংশ। এজন্য সেগুলির সম্বন্ধ প্রকৃতির সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে নয়॥৩১৯॥

প্রশ্ন—নশ্বর বস্তুর প্রতি আকর্ষণ হওয়ার কারণ কী ?

উত্তর—এর কারণ অজ্ঞান, মূর্খতা। অজ্ঞান হলো এই যে, সংসারের সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন দুঃখকে আমরা সংসারের দ্বারা দূর করতে চাই॥৩২০॥

প্রশ্ন—সাংসারিক আকর্ষণ বিনাশ কী করে হবে ?

উত্তর—যতটা সুখ পেয়েছেন তার চেয়েও বেশি দুঃখ হলে সেই আকর্ষণ দূর হয়ে যাবে। এই দুঃখ জাগ্রত হবে চিন্তাভাবনার দ্বারা অথবা সৎসঙ্গের দ্বারা। তাতেও যদি না হয় তাহলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন। চিন্তা-ভাবনার দ্বারা এই আকর্ষণ ততটা তাড়াতাড়ি দূর হবে না যত তাড়াতাড়ি অপরকে সুখ প্রদানে অথবা ভগবানের শরণ নিয়ে তাঁকে ডাকার দ্বারা হবে। ভগবানের প্রতি যাঁদের রুচি, ভোগে যাঁদের রুচি নেই এমন মানুষদের সঙ্গ করলেও সংসারের আকর্ষণ দূর হয়ে যায়॥৩২১॥

প্রশ্ন—ভগবান সাংসারিক আকর্ষণ কেন নষ্ট করেন না ?

উত্তর—ভগবান নিজে থেকে কারও সুখ দূর করেন না, সেই কাজ চোর ডাকাতদের॥৩২২॥

প্রশ্ন—আমরা সাংসারিক আসক্তি দূর করতে চাই, তাহলে ভগবান কেন তা ছাড়ান না ?

উত্তর—সাংসারিক আকর্ষণ প্রবল। কিন্তু তাকে দূর করবার ইচ্ছা দুর্বল। তাই ভগবান ছাড়ান না॥৩২৩॥

প্রশ্ন—সংসারের আকর্ষণ দূর করবার ভাল উপায় কী ?

উত্তর—বস্তুকে আসক্তিপূর্বক গ্রহণ করবেন না। তবে ভজনা করবেন অনুরাগের সঙ্গে (প্রেমপূর্বক)। বস্তু গ্রহণ করার সময়, ভোগ করবার সময় হৃদয়কে দৃঢ় রাখবেন। অর্থাৎ ভোগে রস গ্রহণ না করে তাতে নির্লিপ্ত

থাকবেন। যেমন গলে যাওয়া মোমের উপর রং ঢাললে রং তার ভিতরে ঢুকে যায় তেমনই হৃদয় দ্রবিত হলে বস্তুগুলির প্রভাব হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে যায়॥৩২৪॥

প্রশ্ন—যা প্রত্যয় হয় সেই সংসারের সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব কী করে মেনে নেব ?

উত্তর—যা দৃষ্ট হয় তার অস্তিত্ব থাকে— এমনটি ভাবার প্রয়োজন নেই। মরীচিকার জল দেখা যায়, রজ্জুতে সর্প দর্শন হয়— এগুলির কী অস্তিত্ব আছে ?

বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে সংসার আগেও অস্তিত্বহীন ছিল, পরেও তাই হয়ে যাবে। আর বর্তমানে তা প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। যা প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছে তার অস্তিত্ব কী করে স্বীকার করা যেতে পারে ? বর্তমানে উৎপত্তি ও বিনাশের প্রবাহকে স্থিতিরূপে প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে। যেমন আগে যখন মহাভারতের ঘটনাগুলি বর্তমান অবস্থায় ছিল সেগুলিকে খুবই বাস্তব বলে মনে হতো। কিন্তু এখন সেগুলি কোথায় ? আজ তো কেবল তার কথাগুলিই অবশিষ্ট রয়েছে। তেমনই বর্তমানে যেগুলি দেখা যাচ্ছে সেগুলিও ভবিষ্যতে থাকবে না।

বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে চারা, চারা থেকে গাছ জন্ম নেয়, তারপর তাতে ফুল-ফল হয়। এইভাবে সংসারে নিরন্তর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। অঙ্কুরের যখন উদ্গম হলো তখন আর বীজ থাকল না, যখন চারা হলো তখন অঙ্কুর থাকল না, গাছ যখন হলো তখন চারা থাকল না। তাৎপর্য হলো সংসারে কোনোকিছুই স্থায়ী নয়।

সংসারের তো অস্তিত্বই নেই। তার যদি উপলব্ধি হয় তাতেই বা কী, আর উপলব্ধি না হলেই বা কী ! ॥৩২৫॥

প্রশ্ন—সংসারকে অবাস্তব বলে মনে করব, নাকি তার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধকে অস্বীকার করব ?

উত্তর—কথা একটিই। সংসারকে অবাস্তব মনে করা অপেক্ষা নিজের সম্বন্ধকে অস্বীকার করা সহজ এবং শ্রেষ্ঠ। সংসার সৎ হোক অথবা অ-সৎ

তাতে আমাদের কিছু আসে-যায় না। যেমন, স্বপ্ন সত্য হলেও স্বপ্ন, না হলেও তাই। তাতে আমাদের কী সম্পর্ক ? দু-একটি নয়, চুরাশি লক্ষ যোনি পার হয়েছে, কিন্তু আমরা সেই রকমই থেকে গিয়েছি। যখন চুরাশি লক্ষ যোনির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ থাকেনি তাহলে এই একটি শরীরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কেমন করে থাকবে ? সম্বন্ধ রাখা সম্ভবই নয়॥৩২৬॥

প্রশ্ন—আমাদের স্বরূপ সত্তামাত্র, আমাদের স্থিতিও কেবল সত্তাতেই—একথা জেনেও যদি সংসারে আকর্ষণ হয় তখন সাধক কী করবেন ?

উত্তর—সংসারের প্রতি আকর্ষণ হলো—এতে ক্ষতি নেই কিন্তু সেই আকর্ষণকে সত্য বলে মেনে নেন, এটাই ক্ষতিকারক। আকর্ষণ চলে যাবে, কিন্তু 'আমি' (সত্তা) থেকে যাবে। বাস্তবে আকর্ষণ হওয়াও চলে যাবার নাম আবার আকর্ষণ না হওয়াও চলে যাবার নাম। আকর্ষণকে গুরুত্ব দেওয়াই হলো ব্যাধি।

প্রত্যেক সাংসারিক ভোগে রুচি হয় আবার অরুচিও হয়। রুচিকে স্থায়ী করা এবং অরুচিকে স্থায়ী না করা হলো ভুল। এই ভুলের কারণ হলো মূর্খতা॥৩২৭॥

প্রশ্ন—সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক কিসের উপর টিকে আছে ?

উত্তর—সুখলোলুপতার উপর॥৩২৮॥

প্রশ্ন—সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও কীকরে দৃঢ় হয়ে গেল ?

উত্তর—সংশ্রবজনিত সুখের লোলুপতার কারণে মিথ্যা স্বীকৃতিও দৃঢ় হয়ে গিয়েছে। কেননা সাংসারিক সুখ আরম্ভে অমৃতের মতো মনে হয়—'**বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্**' (গীতা ১৮।৩৮)। এজন্য মানুষ তাতে বদ্ধ হয়ে যায়। তার বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, সে অন্ধ হয়ে যায়॥৩২৯॥

প্রশ্ন—এই সুখ-লোলুপতা ত্যাগ করবার উপায় কী ?

উত্তর—উপায় হলো সৎসঙ্গ॥৩৩০॥

প্রশ্ন—সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করতে অশক্ত বোধ হয় কেন ?

উত্তর—কেননা সংসার থেকে সুখ আহরণ করে থাকি॥৩৩১॥

প্রশ্ন—সুখ ত্যাগ করতেও অপারগ মনে হয়, কী করব ?

উত্তর—এই দুর্বলতা অপরকে সুখ দিলে অপসারিত হবে। মনুষ্য-শরীর সুখ ভোগের জন্য নয়—'**এহি তন কর ফল বিষয় না ভাঈ।**' (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৪।১)॥৩৩২॥

প্রশ্ন—অ-সতের কোনো অস্তিত্ব নেই— এটি জেনেও ত্যাগ করা কঠিন কেন মনে হয় ?

উত্তর—আমরা আলোচনা করবার সময় সংসারকে অ-সৎ বলে মেনে নেই কিন্তু অন্য সময় অ-সতের সঙ্গ থেকে সুখ ভোগ করি। এই সুখাসক্তির কারণেই অ-সৎকে ত্যাগ করা কঠিন মনে হয়। অ-সতের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সুখ-লোলুপতার জন্য তাকে সত্য বোধ হয় ॥৩৩৩॥

প্রশ্ন—সংসারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, নাকি সংসারের অস্তিত্বই নেই ?

উত্তর—যদি ভিন্ন অস্তিত্ব বলে মনে করেন তাহলে সংসার স্বতন্ত্র কিছু নয়। আর যদি তা না মানেন তবে সংসারের অস্তিত্বই নেই। সংসারের আলাদা অস্তিত্ব নেই— এটি হলো সাধকদের কথা। আর সংসারের কোন অস্তিত্বই নেই— এটি হলো সিদ্ধপুরুষদের কথা॥৩৩৪॥

প্রশ্ন—যা জ্ঞান হয় তা সবই হলো জড় সংসার, কেননা তাতে ত্রিপুটি আছে। ভগবান বা স্বয়ং (আত্মা)-কে যখন জানা যায় তাহলে তারাও কি জড় ?

উত্তর—ভগবান জ্ঞাত হন না, তাঁকে মানা হয়ে থাকে। মানার মধ্যে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস প্রধান থাকে, সেখানে ত্রিপুটি প্রধান নয়। স্বয়ং (নিজস্ব সত্ত্বা)ও জ্ঞাত হন না, তিনি অনুভূতির মধ্যে আসেন। অনুভূতিতে ত্রিপুটি হয় না॥৩৩৫॥

প্রশ্ন—সংসারের সম্বন্ধ (বন্ধন) কবে দূর হবে ?

উত্তর—যখন আমরা বাসনাহীন এবং প্রয়াসহীন হয়ে যাব তখন তা দূর হবে। কারণ সংসারের স্বরূপ হলো পদার্থ এবং ক্রিয়া। বাসনাহীন হলে বস্তুর আকর্ষণ অপসারিত হবে এবং প্রয়াসহীন হলে ক্রিয়ার আকর্ষণ নাশ হবে। আমরা তখনই বাসনাহীন এবং প্রয়াসহীন হব যখন আমরা এই সত্য উপলব্ধি করব যে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে আমার কিছুই নেই॥৩৩৬॥

প্রশ্ন—পরিবর্তনশীলের আসক্তি কী করে দূর হবে ?

উত্তর—তাকে দূর করতে হয় না, তা নিজে থেকেই সরে যাবে। ভালো উপায় হলো তাকে উপেক্ষা করা, তাকে গুরুত্ব না দেওয়া। তাকে গুরুত্ব দিয়ে দূর করবার চেষ্টা করাটাই ভুল॥৩৩৭॥

প্রশ্ন—সংসারকে ভাল লাগে না। তবু তাতে ডুবে যাই। কী করব ?

উত্তর—বাস্তবে সংসারকে ভাল লাগে। যদি সংসারকে খারাপ লাগত তাহলে ভোগে নিমজ্জিত থাকতে পারতে না॥৩৩৮॥

~~0~~

সৎসঙ্গ

প্রশ্ন—সন্তদের সঙ্গ ভাগ্যবলে পাওয়া যায়, নাকি ভগবৎ কৃপায় ?

উত্তর—সন্তদের সঙ্গ পাওয়া যায় ভাগ্যগুণে— **'পুন্য পুঞ্জ বিনু মিলহিঁ ন সন্তা'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড, ৪৫।৩) । ভগবৎকৃপাতেও পাওয়া যায়—**'জব দ্রবৈ দীনদয়ালু রাঘব সাধু-সংগতি পাইয়ে'** (বিনয় পত্রিকা ১৩৬।১০) এবং নিজের ব্যাকুলতা থেকেও পাওয়া যায়—**'জেহি কেঁ জেহি পর সত্য সনেহূ। সো তেহি মিলই ন কছু সন্দেহূ॥'** (শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ১৫৯।৩)। কিন্তু প্রবল অনুরাগ থাকলেই তা থেকে লাভবান হওয়া যায় অর্থাৎ লাভ-অলাভ নিজেদেরই হাতে ॥৩৩৯॥

প্রশ্ন—সৎসঙ্গের স্বরূপ কী ?

উত্তর—সৎ-তত্ত্বতে (পরমাত্মায়) কামনাহীন প্রেমই হলো সৎসঙ্গ। আবার জীবন্মুক্ত সন্তের সঙ্গে নিষ্কাম প্রেমও সৎসঙ্গ। জীবন্মুক্ত সন্তের সঙ্গ করাও সৎসঙ্গ। সংসারের প্রতি বীতরাগ হওয়াও সৎসঙ্গ। তাৎপর্য হলো এই যে, আমরা যে কোনোভাবেই ভগবানের শরণাপন্ন হই না কেন— সেইটিই হলো সৎসঙ্গ॥৩৪০॥

প্রশ্ন—'তুলসী সংগত সাধু কী, কটৈ কোটি অপরাধ'—সাধুর সংগত কী ?

উত্তর—সাধুর প্রকৃত সংগত হলো— সাধুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাওয়া।

অভিন্ন হওয়ার তাৎপর্য হলো— তাঁদের কথা আগ্রহ সহকারে শুনে সেই মুহূর্ত থেকে তাতে স্থিত হয়ে যাওয়া। তাঁদের কথা ভবিষ্যতে অনুসরণ করা হবে বলে সরিয়ে রাখবেন না। তাঁদের কোনো কথায় যদি সংশয় বা সন্দেহ হয় তাহলে তখনই জিজ্ঞাসা করে নেবেন অথবা একান্তে চিন্তা করে তার মীমাংসা করে নেবেন॥৩৪১॥

প্রশ্ন—সংসারী লোকেরাও সৎসঙ্গে যোগ দেন আবার সাধকরাও সৎসঙ্গে না গিয়ে ঘরে থেকে ভজনা করেন— এর কারণ কী ?

উত্তর—সংসারী লোকেরা যে সৎসঙ্গ পায় তা হলো ভগবানের কৃপা আর সাধকরা যে সৎসঙ্গ করেন না তা হলো তাঁদের আগ্রহের অভাব। কিন্তু সৎসঙ্গ পাওয়া সত্ত্বেও সংসারী লোকেরা বিশেষ লাভবান হতে পারে না আর সাধকরা সৎসঙ্গ করলে বিশেষ লাভ পেতে পারে। তার কারণ সাধনা হলো নিজে উপার্জন করে ধনী হওয়া আর সৎসঙ্গ হলো ধনীর দত্তক পুত্র হওয়া। দত্তক হলে উপার্জিত অর্থ পাওয়া যায়॥৩৪২॥

প্রশ্ন—সৎসঙ্গ করলে কারও জীবন বদলে যায়, কারও বদলায় না। এর কারণ কী ?

উত্তর—কিছু লোক সু-দুরাচারী হয় এবং কিছু লোক দুর্দুরাচারী হয়। সু-দুরাচারীদের উপর সৎসঙ্গের প্রভাব পড়ে কিন্তু দুর্দুরাচারীদের উপর সৎসঙ্গের প্রভাব পড়ে না— **'পাপবন্ত কর সহজ সুভাউ। ভজনু মোর তেহি ভাব না কাউ॥'** (শ্রীরামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড ৪৪।২)

যাদের এই চারটি লক্ষণ আছে তাদের উপর সৎসঙ্গের প্রভাব পড়ে না— (১) অহঙ্কার, (২) অসহিষ্ণুতা, (৩) অজ্ঞতা এবং (৪) কুতর্ক। এই রকম ব্যক্তিদের সংশোধনের একটিই উপায়— আপদ-বিপদ। যখন আপদ-বিপদ আসবে তখনই তাদের চৈতন্য হবে— **'মূর্খাণাং ঔষধং দণ্ডঃ'**॥৩৪৩॥

প্রশ্ন—সৎসঙ্গের মাহাত্মকে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির চেয়েও বেশি কেন বলা হয়েছে ?

উত্তর—সৎসঙ্গ দ্বারা বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। প্রাপ্য বস্তু অপেক্ষা প্রাপকের বিশেষ মহিমা হয়ে থাকে। সৎসঙ্গে তাঁদেরও লাভ হয় যাঁরা বৈকুণ্ঠে যাননি।

বৈকুণ্ঠ লাভ হয়ে গেলে সৎসঙ্গ (সন্ত সমাগম) পাওয়া যাবে এমন নিয়ম নেই কিন্তু সৎসঙ্গ পেলে বৈকুণ্ঠও লাভ হয়ে যায়॥৩৪৪॥

প্রশ্ন—কোনো কোনো লোক সৎসঙ্গ করতে করতে তাকে ছেড়ে দেন। ভাগ্যই কি এর কারণ ?

উত্তর—ভাগ্য কারণ নয়। এর কারণ দুটি — যার সৎসঙ্গ করেন তার মধ্যে অবগুণ দেখা এবং কুসঙ্গ করা। নিজের মধ্যে যখন কু-সংস্কার থাকে তখনই কুসঙ্গের প্রভাব পড়ে। যেমন, যার নারীর প্রতি আসক্তি থাকে তার উপরেই নারীদের সঙ্গের (মেলামেশার) প্রভাব পড়ে। যার ধনের প্রতি আসক্তি আছে তার উপর ধন এবং ধনীর প্রভাব পড়ে।

যাদের সৎসঙ্গ করেন তাদের মধ্যে অবগুণ দেখলে তাদের সঙ্গে লোক-লজ্জার ভয়েও সম্বন্ধ বজায় রাখা ঠিক নয়। এতে লাভ হয় না। সুতরাং এই রকম অবস্থায় তাদের নিন্দা না করে চুপচাপ দূরে সরে যাওয়া উচিত। তারপর আর কারও সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করা উচিত নয়॥৩৪৫॥

প্রশ্ন—প্রায়ই লোকেদের উপর সৎসঙ্গের প্রভাব কম হয়। কিন্তু কুসঙ্গের প্রভাব বেশি হয়। এর কারণ কী ?

উত্তর—যার মধ্যে কুসঙ্গের সংস্কার আছে তার উপরই কুসঙ্গের প্রভাব বেশি হয়। আর যার মধ্যে সৎসঙ্গের সংস্কার আছে তার উপর সৎসঙ্গের প্রভাব বেশি হয়। তার কারণ হলো সমজাতীর মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। এজন্য মানুষের সৎসঙ্গ, সৎ-শাস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাল সংস্কার স্থাপন করা উচিত॥৩৪৬॥

প্রশ্ন—সৎসঙ্গ কীভাবে শুনব যাতে পরে ভুলে না যাই ?

উত্তর—(১) বক্তা কী বলছেন এবং কী বোঝাতে চাইছেন সেটি ভালোভাবে বিচার করুন, (২) শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টির মনন করা উচিত, যাতে পরে অন্যদের শোনান যায়, (৩) যা শুনেছি তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা উচিত, (৪) যারা সৎসঙ্গ শুনেছে তাদের উচিত নিজেদের মধ্যে বসে শ্রুত বিষয়গুলি চর্চা করা॥৩৪৭॥

~~○~~

সাধক

প্রশ্ন—সাধকের কর্তব্য কী ?

উত্তর—সাধকের কর্তব্য হলো সাধ্যকে ভালবাসা এবং অ-সাধনকে ত্যাগ করা। বাসনা-শূন্য হওয়া হলো সাধন এবং কারও কাছ থেকে কিছু চাওয়া হলো অ-সাধন।।৩৪৮।।

প্রশ্ন—সাধক তাঁর ব্যাকুলতা কী করে বাড়াবেন ?

উত্তর—ব্যাকুলতা চিন্তনের ফলে বৃদ্ধি পায়। চিন্তা করতে হবে যে নশ্বর বস্তুগুলির সঙ্গে আমরা কত দিন থাকব ? এইসব বস্তু এবং ব্যক্তি কত দিন আমাদের সঙ্গে থাকবে ? এইভাবেই যদি সাধনা করা হয় তবে কবে সিদ্ধি হবে ? আজ পর্যন্ত যতটা সময়ে যত লাভ হয়েছে সেই গতিতেই যদি সাধনা চলে তাহলে কত সময় লাগবে ? জীবনের ভরসা কী ? প্রভৃতি।।৩৪৯।।

প্রশ্ন—সাধকদের কোন্ বিষয়ে বিশেষ মন দেওয়া দরকার—অ-সাধনকে দূর করবার দিকে, নাকি জপ, ধ্যান প্রভৃতি সাধনার দিকে ?

উত্তর—অ-সাধনকে দূর করবার দিকেই বিশেষ মন দিতে হবে। নশ্বর বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ— এইটিই হলো অ-সাধন। জপ, ধ্যান প্রভৃতি সাধনায় সাধকের আত্মতুষ্টি আসে এই মনে করে যে তিনি অনেক জপ, অনেক ধ্যান প্রভৃতি করেছেন। এই সন্তুষ্টি সাধন-পথের বাধা ।।৩৫০।।

প্রশ্ন—সজ্জন এবং সাধকদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

উত্তর—যিনি সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, যাঁর আচরণ ও চিন্তন উত্তম তিনি 'সজ্জন'। যাঁর মধ্যে কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা, যাঁর উদ্দেশ্য পরমপ্রাপ্তি তিনি হলেন 'সাধক'। সাধক স্বভাবতঃ সজ্জন হয়ে থাকেন, কিন্তু সজ্জন সাধক নাও হতে পারেন।

সজ্জন লৌকিক অহঙ্কারবিশিষ্ট এবং সাধক পারমার্থিক অহঙ্কারবিশিষ্ট। যিনি অপরের মত, সম্প্রদায় প্রভৃতির নিন্দা বা খণ্ডন করেন তিনি সজ্জন হতেও পারেন, কিন্তু সাধক হন না।।৩৫১।।

প্রশ্ন—জ্ঞানযোগী কি যোগভ্রষ্ট হন ?

উত্তর—যে প্রণালীতে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ধ্যান প্রভৃতি সাধনার

অঙ্গ, সেই প্রণালী যেসব জ্ঞানযোগী অনুসরণ করেন তাঁদের যোগভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যেসব জ্ঞানযোগী বিবেকের নির্দেশ মেনে চলেন তাঁদের যোগভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে॥৩৫২॥

প্রশ্ন—সাধকেরা কি দ্রষ্টা-ভাব থেকেও বিরহিত হতে পারেন?

উত্তর—হ্যাঁ, পারেন। যদি না পারেন তবে দ্রষ্টা-ভাব নিজে থেকেই নষ্ট হয়ে যাবে। ভাগবতে আছে— **'পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ'** (১১।২৯।১৮) 'সকল বিষয়ে সংশয়মুক্ত হয়ে সর্বত্র পরমাত্মায় স্থির চিত্ত হয়ে নিবৃত্ত হয়ে যাবেন।' নিবৃত্ত হয়ে গেলে দ্রষ্টা থাকবে না, কেবল পরমাত্মাই থেকে যাবেন। পরমাত্মার মধ্যে দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং দর্শন—এই ত্রিপুট নেই। দৃশ্য থাকলে দ্রষ্টা থাকে। দৃশ্য না থাকলে দ্রষ্টা কী করে হবে?॥৩৫৩॥

প্রশ্ন—যাঁরা পারমার্থিক পথের পথিক তাঁদের কেন বেশি দুঃখে পড়তে হয়?

উত্তর—এমন কোনো নিয়ম নেই। বাস্তবে তাঁদের বেশি দুঃখে পড়তে হয় না কিন্তু বৃত্তি সুখের দিকে থাকায় লোকের চোখে দুঃখ বেশি বলে মনে হয়। সাধকদের উপর দুঃখের বেশি প্রভাব পড়ে না অর্থাৎ তাঁরা দুঃখী হন না। এজন্য দুঃখদায়ক পরিস্থিতি উপস্থিত হলেও তাঁরা পারমার্থিক পথকে ত্যাগ করেন না।

একজন লোক এক সন্তকে বলেছিল যে সীতাকে ত্যাগ করে রাম তাঁকে অনেক দুঃখ দিয়েছিলেন। সন্ত বলেছিলেন যে একথা সীতাকে জিজ্ঞাসা করলে ভালোভাবে জানা যাবে। সীতা দুঃখ মনেই করতেন না। রামের প্রতি সীতার দোষ- দৃষ্টি ছিল না॥৩৫৪॥

~~○~~

সাধন

প্রশ্ন—মনুষ্য-জীবনে কবে থেকে সাধনার আরম্ভ হয়?

উত্তর—যখন মানুষ সংসার জ্বালায় সন্তপ্ত হয় এবং তা থেকে উদ্ধারের চিন্তা করে তখন সাধনা শুরু হয়। তাৎপর্য হলো এই যে, লোকেরা যখন সংসারে সুখ পায় না, শান্তি পায় না তখন সংসারের প্রতি তাদের হতাশা আসতে থাকে। তাদের ভিতর উথল-পাতল হতে থাকে এবং এই চিন্তা উদিত হয় যে তারা যেন সেই সুখ পান যাতে দুঃখ থাকবে না। সেই জীবন চাই যা মৃত্যু রহিত। সেই পদ চাই, যাতে পতন নেই। নিত্যসুখ ছাড়া তারা থাকতে পারেন না। এইরকম চিন্তা থেকেই তাদের সাধনার সূত্রপাত হয় ॥৩৫৫॥

প্রশ্ন—আমাদের সাধনা অগ্রসর হচ্ছে কিনা তা কীকরে বুঝব ?

উত্তর—সংসারের প্রতি আকর্ষণ যত কমে যাবে এবং ভগবানের প্রতি আকর্ষণ যত বেশি হবে ততই আমরা সাধনায় অগ্রসর হব। সাধনায় অগ্রসর হলে আচরণে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ হ্রাস হতে থাকে। মনে শান্তি এবং প্রসন্নতা জাগে। সাংসারিক লাভ-ক্ষতিতে হর্ষ-শোক কম হয়॥৩৫৬॥

প্রশ্ন—কিছু লোক বলে যে যারা পাপ করে তারাই ভজন, সৎসঙ্গ প্রভৃতি করবে। আমরা পাপ করি না, তাহলে আমরা কেন ভজনা করব ?

মন পরিষ্কার থাকলেই হল, *'মন চঙ্গা তো কঠৌতী মেঁ গঙ্গা'*, পাঠ-পূজা করে কী লাভ ?

উত্তর—তাঁদের এই কথা বলতে হবে যে সকল পাপের মূল হলো 'কামনা'। আপনাদের ভিতরে তো তা রয়েছে **'কাম এষ ক্রোধ এষঃ'** (গীতা ৩।৩৭)। তাহলে আপনারা পাপ থেকে রহিত কেমন করে হলেন ? আসল পাপ হলো ভোগ করা এবং ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করা। এই দুটি ছাড়া আপনারা কী করেন ? কামনা ছাড়া মনে আর কী আছে ? মনে যদি কামনা থাকে তাহলে আর মন পরিষ্কার (চাঙ্গা) হলো কোথায় ! যে পাঠ-পূজা, সন্ধ্যা-বন্দনা করে না তার সঙ্গে পশুর প্রভেদ কোথায় ? পশু তো মুখও ধোয় না।

প্রতিদিন অশুচিতা ঘটে। এজন্য প্রতিদিন শৌচ-স্নান করতে হয়। প্রতিদিন বাসন মাজতে হয়। মানুষ প্রতিদিন যেসব কাজ করে তা থেকে দোষ সৃষ্টি হয়— **'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ'** (গীতা ১৮।৪৮)। এই দোষগুলিকে শুদ্ধ করবার জন্য পাঠ-পূজা, ভজন-ধ্যান প্রভৃতি করা প্রয়োজন।

মন পরিস্কার থাকা চাই, পূজা-পাঠ করে কী লাভ এমন কথা তখনই আসে যখন মন অপরিষ্কার থাকে। মন যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে তো শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কাজ হতেই পারে না। যদি মনে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা উদিত হয় তাহলে তা হলো মনের মালিন্যের প্রকাশ॥৩৫৭॥

প্রশ্ন—জপ, ধ্যান প্রভৃতি সাধন দ্বারা কি আত্মোন্নতি লাভ হয় ? সেগুলি করার সার্থকতা কী ?

উত্তর—জপ, ধ্যান প্রভৃতির দ্বারা বিবেকের বিকাশ হয়, ভগবানে শরণাগতি আসে, অন্তঃকরণে পারমার্থিক রুচি সৃষ্ট হয় এবং সংসারের আকর্ষণ কমে যায়। এইভাবে সংসারে বীতরাগ জন্মে এবং ভগবানের প্রতি প্রেম জন্মায়॥৩৫৮॥

প্রশ্ন—ভজনা করা কী ?

উত্তর—ভগবৎ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যে জপ, চিন্তন, স্বাধ্যায়, বিচার প্রভৃতি করা হয় তাই হলো ভজনা। ভগবানের প্রতি প্রেম হওয়া, ভগবানের শরণাগত হওয়াও ভজনা এবং সংসারের প্রতি অনাসক্ত হওয়াও ভজনা। কেবল ক্রিয়াসকল দ্বারা ভজনা হয় না বরং তাতে যদি ভগবৎ ভাবনা থাকে তাহলেই ভজনা হয়॥৩৫৯॥

প্রশ্ন—সাধনার স্বরূপ কেমন ?

উত্তর—সাধনার স্বরূপ হলো ভগবানকে লাভ করবার জন্য তৎপরতা॥৩৬০॥

প্রশ্ন—অসাধন কী ?

উত্তর—যা পাওয়া গিয়েছে কিন্তু চলে যাবে তাকে নিজের মনে করা এবং যা পাওয়ার ও চলে যাওয়ার বস্তু নয় তাকে নিজস্ব বলে মনে না করা হলো অসাধন॥৩৬১॥

প্রশ্ন—সাধনালব্ধ সাত্ত্বিক সুখভোগ করা কী ?

উত্তর—তাতে সন্তুষ্ট থাকা। পারমার্থিক উন্নতি হল সহায়ক, কিন্তু সেই উন্নতিতে সন্তুষ্ট থাকা হলো বাধা। সন্তুষ্টি এলে সাধনা আর অগ্রসর হয় না, তাতে প্রতিবন্ধকতা এসে যায়॥৩৬২॥

প্রশ্ন—চেতনা ভুল করে জড়ের সঙ্গে একাত্ম করে নিলে সেই ভুল নিরসনের জন্য যে সাধনা করতে হবে তাও তো চেতনাকেই করতে হয়। সাধনা যখন চেতনাই করবে তখন তাকে অকর্তা কেন মনে করা হবে ?

উত্তর—ভুল (অজ্ঞান) হলো অনাদি। চেতনা ভুল করেনি। যিনি **'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা'**[১] সাধনার কর্তা তিনিই অর্থাৎ যিনি শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন । বাস্তবে ভুল কোনো সাধনার দ্বারা দূর হয় না । মেনে নেওয়া ভুলকে মেনে না নিলেই তা দূর হয়ে যায়॥৩৬৩॥

প্রশ্ন—কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো লোক আগে খুব ভজনা, নামজপ প্রভৃতি করত, কিন্তু পরে সে সব ছেড়ে দিয়েছে— এর কী কারণ ?

উত্তর—এর কারণ হলো কামনা। যেমনটা চায় তেমনটা হয় না— তাতে ভজনা করা ছেড়ে দেয়। তার কারণ কামনাসক্ত ব্যক্তির কাছে ভগবান সাধ্য নন, তিনি তার কাছে কেবল কামনাপূর্তির বিষয়। এজন্য গীতা কামনাকে ত্যাগ করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এই রকম লোককে ভক্তের জীবনচরিত শোনাতে হবে॥৩৬৪॥

প্রশ্ন—কেউ যদি কাকে ইষ্ট মনে করবে, কার সাধনা করবে তা বুঝতে না পারে, তাহলে সে কী করবে ?

উত্তর—নিজের বিচার ভার ত্যাগ করে দিন-রাত নাম জপ শুরু করে দেবে। এতে কিছু দেরি হলেও পথ পেয়ে যাবে॥৩৬৫॥

প্রশ্ন—প্রায়ই দেখা যায় যে দেব-মাহাত্ম্য শুনে লোকে অনেক দেব-দেবীর উপাসনা করতে শুরু করে । কিন্তু পরে ছাড়তে চাইলেও এই ভয়ে ছাড়তে পারে না যে কোন দেবতা হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন, কোনো ক্ষতি হবে ! এই রকম অবস্থায় তাদের কী করা উচিত ?

উত্তর—উপাসনা ত্যাগ করলে দেব-দেবীরা অসন্তুষ্ট হন না, কেননা আমাদের মতো রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ তাঁদের মধ্যে থাকে না। তার কারণ হলো এই যে মূলত উপাস্য-তত্ত্ব একই। যেমন শরীরের অনেকগুলি অঙ্গ হলেও

[১]অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥ (গীতা ৩।২৭)

শরীর এক, সেই রকম দেব-দেবী অনেক হলেও তত্ত্ব একই।

সাধকের উপাস্য দেবতা একজনই হওয়া উচিত। উপাস্য দেবতা অনেক হলে একনিষ্ঠতা থাকে না আর একনিষ্ঠতা না থাকলে সিদ্ধি হবে না॥৩৬৬॥

প্রশ্ন—সন্তদের কাছ থেকে দু রকমের কথা শোনা যায়— এক, নিজের কল্যাণকে উদ্দেশ্য করে সাধনায় লেগে যাও এবং দুই, অপরের কল্যাণের জন্যই সাধনা করবে। এই ধরণের কথার সামঞ্জস্য কোথায় ?

উত্তর—এই দুটি ভেদ সাধকের স্বভাব অনুসারে হয়। আসল কথা হলো — কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিজেও লেগে পড় এবং অপরকেও লাগাও— **'স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৩১)॥৩৬৭॥

প্রশ্ন—বিবাহাদির ফলে সাংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ যেমন সহজে হয়ে যায়, ভগবৎ সম্বন্ধ সেই রকম সহজে কেন হয় না ?

উত্তর—তার কারণ হলো আমরা নিজেদের দেহ রূপে মেনে রেখেছি। যদি তা না মনে করি তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ সহজে হতে পারে ॥৩৬৮॥

প্রশ্ন—আমরা সাধনা করি, কিন্তু তাড়াতাড়ি সাফল্য পাই না কেন ?

উত্তর—তাড়াতাড়ি সাফল্য চাওয়া তো ভোগ। আমাদের কেবল সাধনা করে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি সফলতা পাওয়ার দিকে মন দেওয়া উচিত নয়। তাড়াতাড়ি সিদ্ধি লাভ করে পরে কী করবেন ? এই কাজই তো করবেন॥৩৬৯॥

~~o~~

সুখ-দুঃখ

প্রশ্ন—সুখ দুঃখের অনুভূতি স্বয়ং-এর হয়। দুঃখের কারণ হলো অজ্ঞানতা। তাহলে এই অজ্ঞানতা স্বয়ং-এ আছে নাকি কারণ-শরীরে আছে ?

উত্তর—স্বয়ং সুখ-দুঃখ অনুভব করে না। কিন্তু সুখী বা দুঃখী হয়ে পড়ে । অজ্ঞানতা কারণ-শরীরে থাকে, কিন্তু স্বয়ং তাতে তাদাত্ম করে নেয়, তার সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করে এবং সুখী দুঃখী হয়ে যায়।

শরীরের সঙ্গে একাত্মতা মেনে নেওয়া হয়েছে, এইটিই অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতার কারণ হলো শরীরের মধ্যে যেসব পরিবর্তন হয় সেগুলিকে

নিজের বলে মেনে নেওয়া অর্থাৎ অনুকূলতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে সুখী এবং প্রতিকূলতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে দুঃখী হওয়া। বাস্তবে স্বয়ং সুখী বা দুঃখীও হয় না, সুখ বা দুঃখকে স্বীকার করে নেয়।

সুখ-দুঃখ যায়-আসে, কিন্তু স্বয়ং যাওয়া আসা করে না। সুখ-দুঃখ থাকে না, কিন্তু স্বয়ং অবিচল থাকে। অতএব স্বয়ং সুখ-দুঃখ থেকে ভিন্ন। সুখ-দুঃখের আসা-যাওয়ার এবং স্বয়ং-এর থেকে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে॥৩৭০॥

প্রশ্ন—তাহলে আমরা সুখ-দুঃখে কেন অভিভূত হই?

উত্তর—আমি পৃথক এবং সুখ-দুঃখও আলাদা আমরা তা মানি না। আমরা সুখ-দুঃখের আগমনের, তাদের স্বরূপকে এবং তাদের চলে যাওয়াকে জানি, এইটিই হলো বিবেক। এই বিবেকবোধে অবিচল থাকতে পারি না— এইটিই হলো ভুল॥৩৭১॥

প্রশ্ন—বিবেকবোধে অবিচল থাকা অসম্ভব মনে হয় কেন?

উত্তর—আমরা সুখভোগকে এবং দুঃখভোগকে আঁকড়ে থাকি। এইজন্য অসম্ভব বোধ হয়। কিন্তু সুখের ভোগ এবং দুঃখের ভয় থেকে যাবার নয়, অথচ আমরা হলাম থেকে যাবার— এই অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। সুখের লালসা এবং দুঃখের ভীতিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। সেগুলিকে উপেক্ষা করতে হবে, সেগুলি থেকে নিস্পৃহ থাকতে হবে। সেগুলির সঙ্গে একত্ব করলে হবে না। তাহলে আর অসামর্থ্য থাকবে না॥৩৭২॥

প্রশ্ন—সুখ-দুঃখ যে থেকে যাবার নয় তা তো প্রমাণিত। কিন্তু সেগুলি যে আসে না, তা প্রমাণিত হলো কী করে, কারণ তাদের আগমন দেখতে পাওয়া যায়।

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে এগুলি প্রবাহিত হতে থাকে কিন্তু আমরা সেগুলির আগমন ঘটেছে— এরূপ মনে করে থাকি। এটিও তখনই বলা যায় যখন আমরা এগুলির অস্তিত্ব মেনে নেই। অস্তিত্ব না মানলে তা থাকেই না। স্বয়ং-ই তাদের আসা-যাওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছে। এই স্বীকৃতি দেওয়ার কারণ হলো বিবেকের নূন্যতা, অজ্ঞানতা, বুদ্ধিহীনতা এবং মূর্খতা॥৩৭৩॥

প্রশ্ন—একটি কথা হলো যারা সুখভোগী তাদের দুঃখভোগ করতেই হয়। দ্বিতীয় কথা, দুঃখের কারণ ভোগ নয়, ভোগের ইচ্ছা—দুটি কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—সুখভোগের সংস্কার সুখভোগের ইচ্ছা সৃষ্টি করে। আসক্তি নিয়ে ভোগ করতে থাকলে প্রবল সংস্কার সৃষ্টি হয়। তা অন্তঃকরণে ভোগের লালসা উদ্‌দৃক্ত করে এবং আবার ভোগে প্রবৃত্ত করে। ভোগের লালসা থাকলে 'সুখের কারণ হলো ভোগ' এই ভাব উৎপন্ন হয়। তার ফলে আমরা সুখভোগ ছাড়া থাকতে পারি না।

ভোগ হলো দুর্গতির কারণ এবং ভোগের ইচ্ছা দুঃখের কারণ ॥৩৭৪॥

প্রশ্ন—সুখ পেলে দুঃখ দূর হবে। সুখ না পেলে দুঃখ ঘুচবে কী করে ?

উত্তর—দুঃখ থেকে বাঁচবার উপায় সুখ নয়, তা হলো ত্যাগ। এজন্য অর্থের অভাব কখনও অর্থ দিয়ে দূর করা যায় না। এইটি হলো নিয়ম। অর্থের অভাব আমরা অর্থ দিয়ে দূর করব— এর মতো মূর্খতা আর নেই। যতই অর্থ পাওয়া যায় ততই তার অভাববোধ বাড়তে থাকে—**'জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ'** ॥৩৭৫॥

প্রশ্ন—কোনো কোনো লোক দুঃখে পড়লে বেশি করে ভজনা করে। আবার কোনো কোনো লোক দুঃখ উপস্থিত হলে ভজনা করা ছেড়ে দেয়। এর কারণ কী ?

উত্তর—যারা ভজনা করবার জন্যই ভজনা করে তারা দুঃখ এলেও ভজনা ত্যাগ করে না। কিন্তু যারা সুখ কামনায় (সকামভাবে) ভজনা করে তাদের ভজনা দুঃখ এলে বন্ধ হয়ে যায়। তাৎপর্য হলো এই, 'ভজনা করলে সুখ পাওয়া যাবে' এই প্রলোভন থাকলে দুঃখ এলে ভজনা বন্ধ হয়ে যায়। এইজন্যই কামনা ত্যাগের কথা বলা হয়ে থাকে ॥৩৭৬॥

প্রশ্ন—দুঃখের প্রভাব যাতে না পড়ে তার জন্য কী করব ?

উত্তর—দুঃখের প্রভাব নিজের উপর পড়ে না। কেননা দুঃখ তো আসে-যায়, কিন্তু আমরা যেমনকার তেমন থাকি। আমরা জোর করে দুঃখের প্রভাবকে মেনে নিই ॥৩৭৭॥

~~○~~

সুখাসক্তি

প্রশ্ন—সুখাসক্তিকে কী করে ত্যাগ করা যাবে ?

উত্তর—মনুষ্য শরীর সুখভোগের জন্য নয়, তা হলো সুখদানের জন্য। স্বার্থভাব ত্যাগ করে অপরকে সুখ প্রদান করলে নিজের সুখাসক্তি দূর হয়ে যায়। নিজের বিবেককে গুরুত্ব দিলেও সুখাসক্তির ত্যাগ হয়ে যায়। যদি কেঁদে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, 'হে আমার প্রভু !, হে আমার প্রভু !!' বলে ভগবানকে ডাকতে থাকেন তাহলে ভগবানের কৃপায় সুখাসক্তি দূর হয়ে যায়। কিন্তু এই সব উপায় তখনই কার্যকর হবে যখন আমরা আন্তরিকভাবে সুখলোলুপতাকে ত্যাগ করতে চাইব ॥৩৭৮॥

প্রশ্ন—আসক্তি দূর করবার জন্য '*নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ*' (অসতের অস্তিত্ব নেই)- এই ভাব ভালো, নাকি '*বাসুদেবঃ সর্বম্*' (সব কিছুই ভগবান) এই ভাব ভালো ?

উত্তর—সংসারের প্রতি যাদের আসক্তি বেশি তাদের পক্ষে **'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** এই ভাবটি কাজে আসবে, আর যাদের আসক্তি কম তাদের পক্ষে **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** এই ভাবটি ভালো। বাস্তবে দুটি ভাবই এক। দুটির মধ্যে কোনো একটি লাভ হলে দুটিই হয়ে যাবে।

যাদের সাপের ভয় বেশি তাদের বলতে হয় 'সাপ নয় দড়ি'। কিন্তু যারা ভয় করে না তাদের কাছে 'দড়ি' এইটুকু বলাই যথেষ্ট। তাৎপর্য হলো, যাদের বেশি আসক্তি তাদের কাছে নিষেধ প্রধান ॥৩৭৯॥

প্রশ্ন—বড় সুখ না পেলে ছোটো সুখের আসক্তি দূর কী করে হবে ?

উত্তর—এর উপায় হলো, পারমার্থিক বিষয়ে সামান্য সুখ পেলেও তাকে গ্রহণ করা, তাকে বিশ্বাস করা। যেমন সৎসঙ্গ, কথকতা-কীর্তন প্রভৃতিতে ভোগ সামগ্রী না থাকলেও তাতে সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা তাকে মূল্য দেই না। যদি পারমার্থিক বিষয়ে সামান্য সুখ পাওয়া যায় এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হই আর সাংসারিক সুখের আকর্ষণ ত্যাগ করতে থাকি তাহলে মহান সুখের অনুভূতি লাভ হবে।

বাস্তবে আমাদের সামান্য বা বড়—কোন সুখেই আকৃষ্ট হলে চলবে না,

কিছুই নেবার নেই॥৩৮০॥

প্রশ্ন—নিয়ম হলো যে সুখভোগী দুঃখকে এড়াতে পারে না। কেউ যদি মিষ্টি খায় এবং তার স্বাদ ও সুখ অনুভব করে তাহলে পরে তার দুঃখ কেমন হবে ?

উত্তর—স্বাদের অনুভূতি হওয়া এবং সুখ গ্রহণ করা দুটি ভিন্ন জিনিস। স্বাদের আস্বাদন হওয়া সুখ গ্রহণের মতো দোষযুক্ত নয়। সুখ গ্রহণের তাৎপর্য হলো সেই বস্তুর লোভ হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে যাওয়া। লোভ স্থায়ী হয়ে গেলে সেই বস্তুর প্রতি মমত্ব, আসক্তি এসে থাকে। পরে সেই বস্তু যখন পাওয়া যাবে না বা লুণ্ঠিত হবে তখন দুঃখ হবে। অতএব স্বাদের, সুখের জ্ঞান হওয়া দোষ নয়, দোষ হলো আসক্তি জন্মান॥৩৮১॥

প্রশ্ন—যখন সংসারের সঙ্গে চেতনা (স্বয়ং)-এর সম্বন্ধই নেই তখন সম্বন্ধজনিত সুখ কেমন করে হবে ?

উত্তর—সম্বন্ধজনিত সুখ বাস্তবে সুখ নয়। তা হলো মেনে নেওয়া সুখ। যেমন, ব্যাঙ্কে টাকা আছে। এই তুষ্টিভাব থেকেই অনুভব এমন হয় যে আমি ধনী। কিন্তু এই সুখ তো কেবল মেনে নেওয়া সুখ॥৩৮২॥

প্রশ্ন—কোনো বস্তু খাওয়ার রুচি থাকা বা অরুচি থাকা দোষ, না দোষ নয় ?

উত্তর—খাদ্যে রুচি বা অরুচি শরীরের স্বাভাবিক প্রয়োজনকে নিয়েও হয় আবার সুখবুদ্ধিকে নিয়েও হয়। কিন্তু দুটির বিশ্লেষণ করা খুব কঠিন। বস্তুতে রুচি আছে, নাকি সুখবুদ্ধি আছে তার বিশ্লেষণ বীতরাগ মহাপুরুষরাই করতে পারেন। তার কারণ সংসারের জ্ঞান সংসার থেকে আলাদা হয়ে গেলেই হয়। ভোগবুদ্ধি যদি না থাকে তাহলে রুচি বা অরুচি থাকা দোষের নয়॥৩৮৩॥

প্রশ্ন—ভোগের পুরাতন সংস্কার আবার ভোগেতেই আকৃষ্ট করে, এই অবস্থায় সাধক কী করবেন ?

উত্তর—সুখ লোলুপতা যতটা বাধক পুরাতন সংস্কার ততটা বাধক নয়। সুখলোলুপতার জন্যই সংস্কার বাধক হয়ে পড়ে। আমরা পুরাতন সংস্কার বশেই সুখ চাই এবং এও চাই যে সংস্কার যেন না আসে, কিন্তু সংস্কার

আমাদের বাধ্য করে। যদি সুখেচ্ছা রোধ করা যায় তাহলে সংস্কার দূর হয়ে যাবে । তার কারণ বাস্তবে সংস্কারের কোন অস্তিত্বই নেই। আমরাই তাকে সত্তা প্রদান করি—ভোগের সময় আমরাই ভোগকে সত্তা প্রদান করি। ভোগ থেকে সুখ গ্রহণ করি—তাতেই ভোগ টিঁকে থাকে। সুখ যদি ভোগ না করি তাহলে ভোগের লিপ্সা হতেই পারে না। সুখ না নিলে, দূর না করলেও ভোগের সংস্কার নিজে থেকেই দুর্বল হয়ে যায়। সুখ নিলে পুরাতন সংস্কার নতুন ভোগ করবার মতো নতুন হতে থাকে।

পুরাতন সংস্কার জাগলে সাধক তাকে উপেক্ষা করবেন। বিরোধও করবেন না, অনুমোদনও করবেন না। অসতের সংস্কারও অসৎ-ই হয়ে থাকে। অসতের অস্তিত্বই নেই- **'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** (গীতা ২।১৬)॥৩৮৪॥

প্রশ্ন—নিষিদ্ধ ভোগের আসক্তি থেকে কী করে মুক্তি পাওয়া যায় ?

উত্তর—নিষিদ্ধ ভোগের প্রতি আসক্তি খারাপ স্বভাবের জন্য হয়। স্বভাবের সংস্কার হয় সৎসঙ্গ, সদ্বিচার, সৎ শাস্ত্রের দ্বারা বিবেক জাগ্রত হলে অথবা ভগবানের শরণাগত হলে।

ভাবনায় আসলে পুরাতন ভোগ নতুন হতে থাকে। ভাবতে থাকলে পুরাতন ভোগ নতুন ভোগের মতোই অনর্থকারী হয়ে যায়। কেউ যদি ষাট বছর আগে ভোগ করে থাকে কিন্তু এখন সেটিকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে তাহলে সেটি নতুন ভোগ হয়ে যায়। মানুষ পুরাতন ভোগকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে তাকে নতুন করতে থাকে। সেজন্য তার আসক্তি দূর হয় না। এজন্য যদি পুরাতন ভোগের কথা মনে পড়ে যায় তাহলে তা থেকে সুখানুভূতি নেবেন না, নিলেই তা নতুন হয়ে যায়, তা সত্তা লাভ করবে ॥ ৩৮৫ ॥

~~০~~

সেবা

প্রশ্ন—সেবার মূল কথা কী ?

উত্তর—কাউকে দুঃখ না দেওয়া, কারও অহিত না করা॥৩৮৬॥

প্রশ্ন—দেশের সেবা ও মা-বাবার সেবা, কোনটি করা ভাল ?

উত্তর—প্রথম হলো মা-বাবার সেবা করা এবং দ্বিতীয় হলো দেশের

সেবা করা। তার কারণ মা-বাবা আমাদের শরীর দিয়েছেন, তার পালন পোষণ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়ে যোগ্য করে তুলেছেন। তাই তাঁদের কাছে আমরা ঋণী। প্রথমে ঋণ পরিশোধ করা উচিত। তারপর দেশসেবা, দান প্রভৃতি করা যেতে পারে । ঋণ পরিশোধ না করে দান করবার কোনো অধিকার নেই॥৩৮৭॥

প্রশ্ন—আমরা যা কিছু পেয়ে থাকি সবই তো ভাগ্য বলে । তেমনই অন্যে যা কিছু পায় তা তারা ভাগ্যবলেই পায় । তাহলে অন্যের সেবা কেন করব ?

উত্তর — একথা ঠিক যে অন্য ব্যক্তিরাও সেই জিনিসই পাবে যা তাদের ভাগ্যে লেখা আছে। কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে আমাদের উচিত আমাদের কর্তব্য পালন করা, কর্তব্যের বিভাগ আলাদা । কর্তব্য পালন না করলে দোষ হয়। অতএব আমাদের কর্তব্য পালন (সেবা) করে যেতে হবে, তা তাদের ভাগ্যানুসারে হোক বা না হোক। শিশুর অসুখ করে, মা যদি তাকে সারিয়ে তুলতে না পারেন তাহলে কি তিনি তার সেবা বন্ধ করে দেন ? সেই রকম যাঁরা সজ্জন তাঁরা মায়ের মতো মমত্ব নিয়ে নিজেদের কর্তব্য পালন করেন। তাতে কর্তব্যপরায়ণতা, হিতৈষিতা এবং উদারতার সৃষ্টি হয়। এগুলি হলো দৈবী সম্পদের গুণ। দৈবী সম্পদ মুক্তির জন্য হয়ে থাকে —**'দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়'** (গীতা ১৬।৫)॥৩৮৮॥

প্রশ্ন—কারোর যদি প্রতিকূল অবস্থা আসে তাহলে ভগবানের বিধানেই তা আসে। তবে তাকে সহায়তা করা বা তার সেবা করা কি ভগবানের বিধানের বিরুদ্ধ কাজ নয় ?

উত্তর—ভগবান হলেন বাবার মতো এবং ভক্ত হলেন মায়ের মতো। সুতরাং ভগবানের কাছে বিচার হলো প্রধান আর ভক্তের কাছে 'দয়া' হলো প্রধান, যদিও এই দয়াও ভগবানের কাছ থেকেই লাভ করা। তাই আমাদের কর্তব্য হলো অন্যের সেবা করা। যে অপরের দুঃখে দুঃখী হয় না সে স্বার্থপর এবং অহঙ্কারী। তার অন্তঃকরণ কঠোর। সে সাত্ত্বিক না হয়ে রাজসিক-তামসিক হয়।

একবার মুচিদের বস্তিতে আগুন লেগেছিল এবং তাদের বাড়িগুলি পুড়ে

নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীজয়দয়াল গোয়ন্দকা মহাশয় তাদের নতুন বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার আগুন লেগে সেই বাড়িগুলি আবার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি আবার ঘর তৈরি করে দিতে বলেছিলেন। লোকে বলতে লাগল দ্বিতীয়বার ঘর পুড়ে যাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে যে ভগবানের ইচ্ছা নয়। তিনি বাড়িগুলি পুড়িয়ে দিতেই চান। শ্রীজয়দয়ালজী বলেছিলেন, ভগবানের কাজ পোড়ানো আর আমাদের কাজ তৈরি করে দেওয়া। তিনি আবার ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন॥৩৮৯॥

প্রশ্ন—সেবা ধর্মকে কঠোর কেন বলা হয়েছে— '*সব তেঁ সেবক ধরমু কঠোরা*' (শ্রীরামচরিতমানস, অযোধ্যাকাণ্ড ২০৩।৪)?

উত্তর—সুখ-আরামে আসক্তি থাকলে সেবাকে কঠিন মনে হয়— **'সেবক সুখ চহ মান ভিখারী'** (শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ১৭।৮)। নিজের সুখ আরামকে ত্যাগ করলে সেবা কঠিন নয়, কেননা সেবা করবার সকল সামগ্রী জগতেরই, নিজের নয়। সেই সামগ্রীগুলিকে নিজেদের সুখের জন্য ব্যবহার করা সেবা নয়॥৩৯০॥

প্রশ্ন—দুঃখীকে দেখে করুণাসিক্ত হলে তার সেবা কী করে হল?

উত্তর—করুণাসিক্ত হলে ভগবান তার প্রতি কৃপা করেন এবং নিজেদের অন্তঃকরণও নির্মল হয়। সুখীকে দেখে প্রসন্ন হওয়াও সেবা। তাতে নিজেদের অন্তঃকরণ পবিত্র হয়। অন্যের সুখ-দুঃখের প্রভাব না পড়লে অন্তঃকরণ অশুদ্ধ এবং কঠোর হয়॥৩৯১॥

প্রশ্ন—জড়কে জড়ের সেবায় লাগিয়ে দিলে জড়ের প্রবাহ জড়ের দিকে হয়ে যাবে এবং চেতনা সঙ্গহীন হয়ে মুক্ত হয়ে যাবে— কর্মযোগের এই কথা ঠিকমত বুঝতে পারছি না। কেননা বাস্তবে জড়ের সেবা হয় না, সচেতনের সেবাই হয়ে থাকে। যেমন, সচেতন শরীরের মুখে অন্ন-জল দিলে তার সেবা করা হয়। কিন্তু চেতনাশূণ্য মৃতদেহের মুখে অন্ন-জল দিলে তাতে তার সেবা করা হয় না।

উত্তর—বাস্তবে সেবা জড়ের দ্বারা হয় এবং জড় পর্যন্তই পৌঁছায়। তার কারণ ক্রিয়া এবং তার ফল (পদার্থ) দুটিরই আদি এবং অন্ত আছে বলে

সেগুলি জড়েই থেকে যায়, চেতনা পর্যন্ত পৌঁছায় না। কিন্তু চেতন শরীরের (জড়ের) সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনেছে আর সেজন্য শরীরের সেবাকে চেতনের (শরীরের মালিকের) সেবা বলে মনে করা হয়। জ্ঞানযোগেও জড় মন-বুদ্ধির দ্বারাই জড়কে ত্যাগ করা হয় **'গুণাঃ গুণেষু বর্তন্তে'** (গীতা ৩।২৮)॥৩৯২॥

প্রশ্ন—ধনাদি বস্তু থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধি পর্যন্ত সকল জড় পদার্থ সেবার করণ (সাধন)। এই সব কারণে সেবক চৈতন্যময় হতে পারে, জড় কী করে হবে ?

উত্তর—যে শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে সে হয় কর্তা—**'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭)। তাৎপর্য হলো, অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মাই কর্তা হয়ে থাকে। সেই সেবা করে॥৩৯৩॥

প্রশ্ন—সেবক সেবা রূপে সেব্যতে আত্মমগ্ন হয়ে যায়— এতে 'সেবা' বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর—সেবার অহঙ্কার অর্থাৎ সেবাগিরি না থাকাই হলো প্রকৃত সেবা॥৩৯৪॥

প্রশ্ন—সেবা করে অহঙ্কার হবে না, এর কী উপায় ?

উত্তর—যারই সেবা করবেন, সে কুকুরই হোক আর গাধাই হোক, তাকে নিজের থেকে উন্নত মনে করে, ভগবান মনে করে সেবা করবেন। তাহলে আর অহঙ্কার হবে না॥৩৯৫॥

~~○~~

সৃষ্টি-রচনা

প্রশ্ন—পরমাত্মা হলেন চেতন, তাঁর থেকে জড় সংসার কী করে সৃষ্টি হতে পারে ?

উত্তর—যেমন শরীর থেকে নখ, কেশ প্রভৃতি নিষ্প্রাণ বস্তুও সৃষ্টি হয়, সেই রকমই চেতন পরমাত্মা থেকে জড় সংসার সৃষ্টি হয়ে থাকে॥৩৯৬॥

প্রশ্ন—অক্রিয় তত্ত্ব থেকে ক্রিয়াগুলি কেমন করে সৃষ্টি হয় ?

উত্তর—যেমন হিমালয় থেকে নদীগুলি নির্গত হয় তেমনই অক্রিয় পরমাত্মতত্ত্ব থেকে সকল ক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যেমন হিমালয়ে অন্তঃসলিল রয়েছে তেমনই নির্গুণতত্ত্বেও একটি শক্তি আছে যা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ঘটিয়ে থাকে। যদি তত্ত্বে কোনো শক্তি না থাকত তাহলে সৃষ্টির রচনা কেমন করে হোত ? সেই শক্তি থেকেই সকল ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। চুম্বকের শক্তির দ্বারা যেমন লোহা ঘুরতে থাকে, তেমনই সকল ক্রিয়া সত্তার দ্বারা হয়ে থাকে॥৩৯৭॥

প্রশ্ন—রজ-বীর্যের সংযোগে শরীর গঠিত হয়। তাহলে অগস্ত প্রভৃতির জন্ম কেবল বীর্যের দ্বারা (রজর সংযোগ ছাড়াই) কী করে হয়েছিল ?

উত্তর—বাস্তবে জীবের জন্মে বীর্যই মুখ্য। রজ হলো ক্ষেত্র আর বীর্য হলো বীজ। সমর্থ পুরুষদের বীর্যের এত শক্তি থাকে যে তা রজকে ছাড়াই জীবের জন্ম দিতে পারে। যেমন, যে কোনো বীজই মাটিতে ফেললে অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু ছোলা কেবল জলে ভেজালেই অঙ্কুরিত হয়ে যায়। সমর্থ পুরুষগণ কেবল নিজের সঙ্কল্পের দ্বারাই সৃষ্টি করতে পারেন ॥৩৯৮॥

প্রশ্ন—সৃষ্টি রচনার কাজ ভগবানের অধীন, সন্ত-মহাপুরুষদের অধীন নয়—'জগদ্ব্যাপারবর্জম্' (ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৭), তাহলে বিশ্বামিত্র সৃষ্টির রচনা কেমন করে করেছিলেন ?

উত্তর—বিশ্বামিত্র তাঁর তপোবলে সৃষ্টির রচনা করেছিলেন। তপস্যার বলে যে কাজ করা হয় তা সসীম । এজন্য বিশ্বামিত্রের সৃষ্টিও ছিল সীমিত । বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি-ক্ষমতা তপস্যা থেকে লাভ হয়েছিল। কিন্তু ভগবানের সৃষ্টি-ক্ষমতা স্বতঃসিদ্ধ । ভগবান তো যুক্তযোগী, কিন্তু বিশ্বামিত্র ছিলেন যুঞ্জানযোগী॥৩৯৯॥

প্রশ্ন—শাস্ত্রে অনেক প্রকার সৃষ্টি-রচনার বর্ণনা আছে, তার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর তাৎপর্য হলো এই যে বাস্তবে সংসার নেই, কেবল পরমাত্মাই আছেন—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। সংসার যদি সত্য হোত তাহলে এক প্রকারের বর্ণনাই

থাকতো। নানা প্রকার বর্ণনা থাকায় এটি প্রমাণিত হয় যে সংসারের কোন অস্তিত্ব নেই। বাস্তবে পরমাত্মাই আছেন, তিনি অন্য প্রকারের হন না। সৃষ্টি পরমাত্মা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ সব কিছুর মূলে পরমাত্মাই আছেন— সকলের মধ্যে এইটিই সারকথা ॥৪০০॥

প্রশ্ন—ভগবান কেন সংসার সৃষ্টি করেছেন ?

উত্তর—জীব ভোগ আকাঙ্ক্ষা করে, এজন্য ভগবান তাদের জন্য সংসার সৃষ্টি করেছেন। যেমন, পিতা অর্থ ব্যয় করেও সন্তানের জন্য মাটির খেলনা এনে দেন ; কেননা শিশুটি তাই চায়। বাস্তবে মনুষ্য-শরীর ভোগ করবার জন্য নয়— **'এহি তন কর ফল বিষয় না ভাঈ'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৪।১)। ভগবান সমস্ত জিনিস দিয়েছেন অপরের সেবা করবার জন্য। তার দ্বারা অন্যের সেবা করে জীব নিরাসক্ত-নিরহঙ্কার হয়ে মুক্তি লাভ করবে। ভগবান চান যে জীব সংসারের সেবা করবে এবং তাঁর সঙ্গে প্রেম করবে। কিন্তু জীব প্রদত্ত বস্তুকেই আপনার করে নিয়েছে। কিন্তু যিনি দাতা (ভাগবান) তাঁকে নিজের বলে মানেনি। এজন্য অসাড় জগৎ ও জীবনের সঙ্গেই তারা জড়িয়ে পড়েছে।

তাৎপর্য হলো, ভগবান জীবের উদ্ধারের জন্যই সংসারকে সৃষ্টি করেছেন।।৪০১॥

প্রশ্ন—ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন, নাকি জীবেরা করেছে ?

উত্তর—ভগবানের দ্বারা উৎপন্ন সৃষ্টি বাস্তবে ভগবৎ স্বরূপ। কিন্তু জগৎ রূপে সৃষ্টি জীবকৃত, জীবেরাই জগৎকে জগৎরূপ দিয়েছে—**'যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫)। এজন্য তথাকথিত জগৎ পরমাত্মার দৃষ্টিতেও নেই, মহাত্মাদের দৃষ্টিতেও নেই, আছে কেবল জীবের দৃষ্টিতে। যদি স্বার্থবুদ্ধিতে দেখেন তো জগৎ আছে, আর পরমার্থবুদ্ধিতে দেখলে পরমাত্মাই সব। জীবভাব অর্থাৎ অহংকে দূর করলে জগৎ অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, তখন জগৎ ভগবৎ স্বরূপ জ্ঞান হয়॥৪০২॥

~~○~~

স্বরূপ (স্বয়ং)

প্রশ্ন—স্বরূপের বোধ তখন তখনই কেমন করে হবে ?

উত্তর—বাস্তবে স্বরূপের বোধ সকলের মধ্যেই রয়েছে। যেমন সকলেই অনুভব করে যে 'আমি আছি'। এতে যদি 'আমি'-কে ত্যাগ করে 'আছি'-তে থাকা যায় তাহলে স্বরূপের বোধ হয়ে যায়। কেননা 'আমি' সরে গেলেই 'আছি', 'আছে' হয়ে যাবে। 'আমি'-ই হলো প্রধান বাধা॥৪০৩॥

প্রশ্ন—যা কিছুই করি না কেন 'আমি' এসেই যায় ?

উত্তর—বাস্তবে 'আমি'-ই নেই। 'আমি' এসে যায় এই ধারণা থেকেই 'আমি' এসে যায় ॥৪০৪॥

প্রশ্ন—দুধের মধ্যে ঘি-এর মতো শরীরের সঙ্গে মিশে যাওয়া আত্মাকে আলাদাভাবে কী করে অনুভব করা যাবে ?

উত্তর—দৃষ্টান্ত কেবল এক অংশে খাটে—সর্ব ক্ষেত্রে খাটে না। বাস্তবে দুধ, ঘি-এর মতো আত্মা শরীরের মধ্যে মিশে নেই[১], মিশে থাকতে পারে না, কেবল আমরাই তাকে মিশে আছে বলে বোধ করছি— '**কর্তাহমিতি মন্যতে**' (গীতা ৩।২৭)। শরীর এবং আত্মার মধ্যে একাত্মতা হয়নি, এ শুধু মেনে নেওয়া হয়েছে। কোনো কিছু করলেই শরীরের সঙ্গে সংশ্রব সৃষ্টি হয়, কিছু না করলে শরীরের সম্পর্ক থাকে না।

যেমন সূর্য এবং অন্ধকারের মিলন হয় না, তেমনই আত্মা এবং শরীরের সঙ্গে মিলন হতে পারে না। চেতন জড়ের সঙ্গে, সৎ অ-সতের সঙ্গে, অবিনাশী নশ্বরের সঙ্গে কী করে মিলতে পারে ? কিন্তু অনাদিকাল থেকে সংস্কারের জন্য এই ভ্রমকেই সত্য বলে মনে করা হয়। এই একাত্ম ভাবনা চেষ্টা বা অভ্যাসের দ্বারা দূর হয় না, দূর হয় বিবেক-বিচারের দ্বারা॥৪০৫॥

---

[১]অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ (গীতা ১৩।৩১)

'হে কুন্তীনন্দন। এই পুরুষ স্বয়ং অনাদি হওয়ায় এবং গুণ থেকে রহিত হওয়ায় অবিনাশী পরমাত্মাস্বরূপ। এটি শরীরে অবস্থান করেও কিছু করে না, কিছুতে লিপ্ত হয় না।'

প্রশ্ন—সত্তা সর্বব্যাপক, তাহলে নিজেদের মধ্যে পরিচ্ছিন্নতা কেন অনুভূত হয় ?

উত্তর—পরিচ্ছিন্নতার অনুভূতি হলো বাস্তবে অহঙ্কারের অনুভূতি। পরমাত্মার অনন্ত সত্তাই অহঙ্কারের আবরণে পরিচ্ছিন্ন অনুভূত হয়। তাৎপর্য হলো, সর্বব্যাপক সত্তাকে মন-বুদ্ধির অনুগত ধরলে অথবা মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের সংস্কার থাকলেই তাকে পরিচ্ছিন্ন দেখায়। বুদ্ধিরও জ্ঞাপক অহং-এর অধীন নয়। সেইটিই আমাদের স্বরূপ। আমাদের সত্তা এবং পরমাত্মার সত্তা একই। তিনিই উৎপত্তির আধার এবং প্রতীতির প্রকাশক। প্রতীতির স্বতন্ত্র সত্তা নেই। আচরণের সময় তো মন, বুদ্ধি এবং অহং-এর প্রতীতি হয়। কিন্তু যখন কোনো আচরণ করা হয় না তখন মন, বুদ্ধি এবং অহং— কোনো কিছুই নেই। আচরণের অবস্থাই হোক, এবং আচরণ না থাকার অবস্থাই হোক, 'আছে'-এতে পার্থক্য কিছু থাকে না॥৪০৬॥

প্রশ্ন—মন, বুদ্ধি এবং অহং-এর সংস্কার কী করে দূর হবে ?

উত্তর—মন, বুদ্ধি এবং অহং-কে নিয়ে নাড়াচাড়া করো না। সেগুলিকে বেশী লক্ষ্য করবে না। কেবল যে এক 'আছে' তাকে— সেদিকেই দৃষ্টি রাখ। ব্যষ্টি-ভাব, পরিচ্ছিন্নতা—কোন দিকেই তাকাবে না। একেবারে চুপ করে থাক। তখন সব কিছু নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যাবে। সমুদ্রে বরফের চাঙড় ভাসে। তাকে রাখতেও হয় না, গলাতেও হয় না। একেই সহজাবস্থা বলা হয়॥৪০৭॥

প্রশ্ন—নিজের সত্তার মধ্যে যে একদেশীয়তা (ব্যষ্টি-ভাব) দৃষ্ট হয়, তা কেমন করে দূর হবে ?

উত্তর—এই ভাব দূর করতে 'আছে'-কে ধরতে হবে। বস্তুগুলি ভিন্ন ভিন্ন এবং ব্যষ্টি যুক্ত হয়। কিন্তু সেই সবের মধ্যেই 'আছে' এই একটি-ই থাকে। তথাকথিত বস্তুগুলি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং 'আছে' থেকে যায়। সেই 'আছে'-র অবস্থানই সব বস্তুতে দেখা যায়। যেমন, আছে মানুষ, আছে বস্তু প্রভৃতি। কিন্তু বস্তুগুলিকেই প্রাধান্য দিলে 'আছে'-র প্রতি লক্ষ্য থাকে না। যেমন মানুষ রয়েছে, বস্তু রয়েছে প্রভৃতি।

সত্তা একটিই। সেই একটি সত্তা যখন দেহাশ্রিত হয় তখন তা আমাদের স্বরূপ হয় এবং সর্বব্যাপক হলে তাই পরমাত্মা। শরীরের সম্বন্ধে নিজের সত্তা দেখা যায় এবং সংসারের সম্বন্ধে পরমাত্মার সত্তা দেখা যায়। শরীর-সংসারের সম্বন্ধ যদি না থাকে তাহলে এক চিন্ময় সত্তারই অস্তিত্ব থাকে আর শরীর-সংসারের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। তার কারণ শরীর-সংসার অ-সৎ।

স্বয়ং পরমাত্মার অংশ। অতএব ঘটির জলকে যেমন সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয় তেমনই স্বয়ং-কে পরমাত্মার কাছে অর্পন করে দিয়ে চুপ করে থাকুন। তাহলে ঐ একদেশীয়তা (ব্যষ্টি-ভাব) নিজে থেকেই মিটে যাবে॥৪০৮॥

প্রশ্ন—আমাদের স্বরূপ 'সহজ সুখরাশি'—'*ঈস্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখরাসী॥*' (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৭।১)। এই সহজ সুখ কী করে হারিয়ে যায় ?

উত্তর—এর মূল কারণ হলো নিজেকে শরীর বলে মনে করা। নিজেকে কেবল শরীর মনে করলে বিবেককে অবজ্ঞা করা হয়। বিবেককে যথাযথ গ্রহণ করবার জন্যই ভগবান গীতার আরম্ভে শরীর-শরীরীর আলোচনা করেছেন॥৪০৯॥

প্রশ্ন—'আমি আছি'-নিজের এই অস্তিত্বের (স্বরূপের) অনুভূতি তো সকলেরই হয়। তাহলে আত্মজ্ঞানীগণের নিজেদের অস্তিত্বের অনুভূতি কী রকম হয় ?

উত্তর—নিজের অস্তিত্বের যে অনুভূতি সকলের হয় তাতে ভ্রান্তি (বুদ্ধি বা অহং) তার সঙ্গে মিশে থাকে। সেজন্য বাস্তবে তা 'অসতের অনুভূতি'। কিন্তু আত্মদর্শীর শুদ্ধ স্বরূপের অনুভূতি হয়। এর মধ্যে ভ্রান্তি থাকে না॥৪১০॥

প্রশ্ন—সংসারকে বিশ্বাস করা তো খুবই ক্ষতিকারক। কিন্তু কেউ যদি নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখে তাহলে কী হয় ?

উত্তর—দেখতে হবে যে সে নিজেই নিজেকে কী মনে করে। সে যদি

নিজেকে শরীর বলে মনে করে তাহলে সংসারকে প্রধান মনে করলে যে ফল হয় তারও সেই ফলই হবে। যদি সে নিজেকে 'চিন্ময় সত্তা' মনে করে তাহলে তার সেই ফলই হবে যা (জ্ঞানমার্গে) আত্মদর্শীগণের হয়ে থাকে। তার কারণ-শরীর ও সংসার যেমন অভিন্ন, তেমনি জীবাত্মা ও পরমাত্মাও অভিন্ন ॥ ৪১১॥

প্রশ্ন—প্রত্যেক মানুষের কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য থাকেই। তাহলে অন্যের থেকে ভিন্ন নিজের বৈশিষ্ট্য দেখা বন্ধন কী করে ?

উত্তর—বৈশিষ্ট্য থাকে অহম্ ভাবনার মধ্যে। নিজের মধ্যে অর্থাৎ স্বরূপে নয়। ব্যক্তিভেদ তো থাকবেই, কিন্তু স্বরূপ ভেদ হয় না। অহঙ্কার থাকলে অর্থাৎ জড়, নশ্বর শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলেই নিজের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নিজেদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখলে অহংকার পুষ্ট হয়। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে অন্যদের থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় ততক্ষণ বন্ধন থাকে॥৪১২॥

প্রশ্ন—স্বরূপে তো বৈশিষ্ট্য থাকেই। তাহলে স্বরূপে বৈশিষ্ট্য নেই — এমন কথা বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—স্বরূপের বৈশিষ্ট্য নিরপেক্ষ, সাপেক্ষ নয়। এই বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। স্বরূপের বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির মধ্যে আসতে পারে না আর ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য স্বরূপে আসতে পারে না। বৈশিষ্ট্য দেখলেই প্রকৃতির সত্তা এসে যায়। কেননা প্রকৃতি ছাড়া বৈশিষ্ট্য আসতে পারে না। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে স্বরূপে কোন বৈশিষ্ট্য নেই, স্বরপ হলো নিজেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন সূর্য কারও প্রকাশে প্রকাশিত নয়, নিজেই প্রকাশস্বরূপ॥৪১৩॥

~~O~~

সমাজ-সংস্কার

প্রশ্ন—সমাজ-সংস্কারের উপায় কী ?

উত্তর—নিজেকে সংশোধন করলে সমাজ-সংস্কার নিজে থেকেই হয়ে

যায়, কেননা ব্যক্তিও সমাজেরই অঙ্গ। ব্যক্তিগত জীবন ঠিক নেই, সেই অবস্থায় বড় বড় কথা বললে নিজেরও সংশোধন হয় না, সমাজেরও হয় না। বেশ্যা যদি পাতিব্রত্যের উপদেশ দেয় তো কেমন লাগবে ? অতএব ভালো ভালো কথা নয়, নিজেদের জীবনকেই ভালো করতে হবে। সমাজ সংস্কারের চেষ্টা না করে নিজেদের সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের সংশোধন স্বার্থ এবং অহঙ্কার ত্যাগ করে অপরের কল্যাণ সাধনের মধ্য দিয়ে হতে পারে॥৪১৪॥

প্রশ্ন—সরকারের অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত, নাকি উচিত নয় ?

উত্তর—মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত কাজ। এটি সম্পূর্ণভাবে অন্যায় রোধ করবার দণ্ড। মৃত্যুদণ্ডের দ্বারা পাপী ব্যক্তির শুদ্ধি হয়ে থাকে এবং লোকেদের মধ্যে অন্যায় না করবার ভাবনা জাগ্রত হয়॥৪১৫॥

প্রশ্ন—'দয়াপরবশ' মৃত্যু উচিত, না অনুচিত ?

উত্তর—এটি দয়া নয় , এটি হলো নির্বুদ্ধিতা। ডাক্তারের কর্তব্য হলো এই যে তিনি রুগীকে বাঁচিয়ে রাখতে সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। কেননা কোনো মানুষই মরতে চায় না। যে রুগী কয়েক বছর ধরে অজ্ঞান হয়ে আছে তার কখনও জ্ঞান আসতে পারে। এমন ঘটনা আমি দেখেছি॥৪১৬॥

প্রশ্ন—চারটি বর্ণ এবং আশ্রমের মধ্যে কোন্ বর্ণ এবং আশ্রম শ্রেষ্ঠ ?

উত্তর—সেই বর্ণ এবং আশ্রম শ্রেষ্ঠ যা নিজের কর্তব্য পালন করায়। যে নিজের কর্তব্য পালন করে না, সে হীন হয়ে যায়॥৪১৭॥

প্রশ্ন—সমাজে নানা রকম প্রথা প্রচলিত। সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক আর কোন্‌টি বেঠিক তা কী করে নির্ণয় করব ?

উত্তর—যার মধ্যে নিজের স্বার্থত্যাগ এবং অপরের কল্যাণের ভাব নিহিত আছে সেইটিই ঠিক॥৪১৮॥

~~○~~

প্রকীর্ণ

প্রশ্ন—এক দিকে বলা হয় যে আশা করো না—'*আশা হি পরমং দুঃখম্*' আবার অন্য দিকে বলা হয় যে আশাবাদী হও। কী করা উচিত ?

উত্তর—দুটি কথাই ঠিক। আশা না করার তাৎপর্য হল, সংসারের আশা রেখো না এবং আশাবাদী হওয়ার অর্থ—নিজের উন্নতি অথবা ভগবৎ প্রাপ্তিতে নিরাশ হয়ো না। সতের আশা রেখো, অসতের আশা রেখো না॥৪১৯॥

প্রশ্ন—অবিদ্যা এবং বিপর্যয়ের মধ্যে কী প্রভেদ ?

উত্তর—অনিত্য, অশুচি, অনাত্মা এবং দুঃখে বিপরীত বুদ্ধি অর্থাৎ নিত্য, শুচি, আত্মা এবং সুখ বুদ্ধি হওয়া হলো 'অবিদ্যা' (অজ্ঞানতা)। রজ্জুতে সর্প দর্শন, সজ্জনকে দুর্জন মনে করা প্রভৃতি বৃত্তি হলো 'বিপর্যয়'। অবিদ্যা নিজের মধ্যে থাকে এবং বিপর্যয় বৃত্তি থাকে অন্তঃকরণে। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের মধ্যে অবিদ্যা-দোষ তো থাকে না, কিন্তু বিপর্যয়-দোষ থাকতেও পারে। এজন্য তাঁদের আচরণে ভুল হতে পারে, কিন্তু স্বয়ং-এর ভুল হয় না॥৪২০॥

প্রশ্ন—আত্মদৃষ্টি এবং পরমাত্মদৃষ্টিতে পার্থক্য কী ?

উত্তর—আত্মদৃষ্টিতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় এবং পরমাত্মদৃষ্টিতে প্রেম হয়। আত্মদৃষ্টির দ্বারা 'সৎ' এবং 'চিৎ'-এর অনুভূতি হয় এবং পরমাত্মদৃষ্টির দ্বারা 'আনন্দ'-এর অনুভূতি হয়, যদিও পরমাত্মদৃষ্টিতেও 'সৎ' এবং চিতের অনুভব হয় কিন্তু প্রাধান্য আনন্দের অনুভূতিরই থাকে। তেমনই আত্মদৃষ্টি থেকেও 'আনন্দ'-এর অনুভূতি হয়, তবে তাতে প্রাধান্য থাকে সৎ ও চিৎ-এর ॥৪২১॥

প্রশ্ন—আস্তিক ও নাস্তিক কাকে বলে ?

উত্তর—যিনি না দেখে শুনেও পরমাত্মার সত্তাকে মানেন তিনি হলেন 'আস্তিক'। যিনি পরমাত্মার সত্তাকে না মেনে জগৎ এবং জীবের (আত্মার) সত্তাকে মানেন তিনি 'নাস্তিক'॥৪২২॥

প্রশ্ন—চেতন এবং চিন্ময়-এর মধ্যে পার্থক্য কী ?

উত্তর—'চেতন' হলো সাপেক্ষ অর্থাৎ চেতন জড়ের সাপেক্ষ। কিন্তু 'চিন্ময়' নিরপেক্ষ। চিন্ময়-এর অর্থ কেবল (শুদ্ধ) চেতন॥৪২৩॥

প্রশ্ন—স্মার্ত এবং বৈষ্ণবের মধ্যে কী পার্থক্য ?

উত্তর—যাঁরা মনে করেন যে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, শাস্ত্র যা বলে তা ঠিক তাঁদের স্মার্ত বলা হয়। কিন্তু যাঁরা কেবল ভগবানকেই মানেন তাঁদের বৈষ্ণব বলা হয়। স্মার্তদের মধ্যে কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য থাকে আর বৈষ্ণবদের মধ্যে এক ভগবানেরই প্রাধান্য থাকে। স্মার্তরা হলেন লৌকিক এবং বৈষ্ণবেরা লোকোত্তর[১]॥৪২৪॥

প্রশ্ন—দরিদ্র এবং ধনীর পরিচয় কী ?

উত্তর—প্রাপ্ত বস্তুগুলিতে যিনি সন্তুষ্ট নন এবং যাঁর অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা থাকে তিনি 'দরিদ্র'। তাঁর কাছে অর্থ না থাকলেও তিনি দরিদ্র এবং অর্থ থাকলেও দরিদ্র। প্রাপ্ত বস্তুতে যিনি সন্তুষ্ট এবং অপ্রাপ্তের প্রতি যাঁর আকাঙ্ক্ষা থাকে না তিনি 'ধনী'। তাঁর কাছে অর্থ না থাকলেও তিনি ধনী এবং অর্থ থাকলেও তিনি ধনী॥৪২৫॥

প্রশ্ন—ভগবান বলেছেন—'*মোহি কপট ছল ছিদ্র ন ভাবা*' (শ্রীরামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড ৪৪।৩)- কপট এবং ছলের মধ্যে কী তফাৎ ?

উত্তর—'কপট' অর্থাৎ দম্ভ হয় নিজের অন্তরে। 'ছল' হলো অন্যকে প্রবঞ্চনা করা। অপরের দোষ দেখা হলো ছিদ্রান্বেষণ॥৪২৬॥

প্রশ্ন—গুরু, শাসক এবং নেতা— তিনের মধ্যে কী প্রভেদ ?

উত্তর—গুরু জ্ঞানরূপী আলো প্রদান করে মানুষকে প্রকৃত পথে নিয়ে

---

[১]জগৎ (ক্ষর) এবং জীব (অক্ষর)- দুটিই লৌকিক 'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ' এবং ভগবান এই দুটি থেকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ লোকোত্তর 'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ' (গীতা ১৫।১৭)। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগও লৌকিক- 'লোকেঽস্মিন্দ্বিবিধানিষ্ঠা' (গীতা ৩।৩)। ক্ষরকে নিয়ে কর্মযোগ এবং অক্ষরকে নিয়ে জ্ঞানযোগ অনুসৃত হয়, কিন্তু ভক্তিযোগ লোকোত্তর, যাতে ভগবানের প্রাধান্য থাকে।

আসেন। শাসক দণ্ড দিয়ে প্রকৃত পথে নিয়ে আসেন। নেতা বুঝিয়ে সত্যকার পথে নিয়ে আসেন। গুরু হলেন সৌম্য (দয়ালু) শাসক, রাজা ক্রূর শাসক আর নেতা সাধারণ (সৌম্যও নন, ক্রূরও নন) শাসক॥৪২৭॥

প্রশ্ন—দুঃখ এবং করুণার মধ্যে কী প্রভেদ ?

উত্তর—কেবল নিজের দুঃখে দুঃখী হওয়া হলো দুঃখ এবং অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়া হলো করুণা। দুঃখী হওয়া হলো ভোগ এবং করুণাময় হওয়া হলো ত্যাগ। দুঃখের সময় দৃষ্টি নিজের দিকে থাকে আর করুণার সময় তা থাকে অন্যের দিকে॥৪২৮॥

প্রশ্ন—দেহাত্মা, গৌণাত্মা, অন্তরাত্মা এবং পরমাত্মা— এগুলির মধ্যে কী পার্থক্য ?

উত্তর—শরীরকে 'দেহাত্মা' বলে। পুত্রকে 'গৌণাত্মা' বলে। দেহের সঙ্গে যিনি একাত্ম সেই চেতনসত্তাকে 'অন্তরাত্মা' বলে— '**সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ**' (গীতা ১৫।১৫), '**ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি**' (গীতা ১৮।৬১) যিনি দেহনিরপেক্ষ তিনি পরমাত্মা॥৪২৯॥

প্রশ্ন—নির্বিকল্প স্থিতি (অবস্থা) এবং নির্বিকল্প বোধের মধ্যে কী প্রভেদ ?

উত্তর—নির্বিকল্প স্থিতি কারণ-শরীরে হয় আর নির্বিকল্প বোধ স্বয়ং-এ হয়। নির্বিকল্প স্থিতি সবিকল্পে বদলে যায়, কিন্তু নির্বিকল্প বোধ সবিকল্পে বদলায় না। অবস্থা বদলে যায়, কিন্তু বোধ বদলায় না—'**সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ**' (গীতা ১৪।২)। নির্বিকল্প বোধ অখণ্ড, নিত্য, স্বতঃ স্বাভাবিক এবং নিরপেক্ষ॥৪৩০॥

প্রশ্ন—পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতার মধ্যে কী পার্থক্য ?

উত্তর—পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতার মধ্যে পার্থক্য অনেক। হাড়কে পরিস্কার করতে পারেন, কিন্তু শুদ্ধ করতে পারেন না। কোন্ জিনিসটি শুদ্ধ তা আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ থেকে জানতে পারি। যেমন, অন্যান্য জল অপেক্ষা গঙ্গাজল পবিত্র। গোবর এবং গোমূত্রও পবিত্র॥৪৩১॥

প্রশ্ন—কারণ-শরীরের স্থৈর্য এবং স্বরূপের স্থৈর্যের মধ্যে কী প্রভেদ ?

উত্তর—কারণ-শরীরের স্থিরতা হলো সাপেক্ষ অর্থাৎ তা চাঞ্চল্য অপেক্ষা স্থির, কিন্তু স্বয়ং-এর স্থিরতা নিরপেক্ষ। স্বয়ং কারণ-শরীরের স্থৈর্যেরও প্রকাশক, সাক্ষী॥৪৩২॥

প্রশ্ন—রামায়ণে আছে '*সঠ সুধরহিঁ সতসঙ্গতি পাঈ*' (বালকাণ্ড ৩।৫) এবং '*মূরুখ হৃদয়ঁ ন চেত জৌঁ গুর মিলহিঁ বিরঞ্চি সম*' (লঙ্কাকাণ্ড ১৬খ)। তাহলে '*শঠ*' এর '*মূর্খ*'-এর মধ্যে কী প্রভেদ ?

উত্তর—প্রত্যেক কবি অথবা লেখকের ব্যবহৃত শব্দগুলিতে তাদের এক বিশেষ অর্থ থাকে। এখানে '*শঠ*' হলো সে যে জানে না ; আর সেই হলো মূর্খ যে জানে কিন্তু মানে না॥৪৩৩॥

প্রশ্ন—মুক্ত এবং প্রেমী— এই দুজনের আচরণে কী পার্থক্য ?

উত্তর—যে মুক্ত তার আচরণ হলো সাম্যের এবং নির্বিকারত্বের, কিন্তু প্রেমীর আচরণ প্রেমপূর্ণ হয়ে থাকে, কেননা ভগবানকে ভাল লাগলে তাঁর মন সব কিছুকেই ভাল লাগে॥৪৩৪॥

প্রশ্ন—শেখা এবং জানার মধ্যে কী প্রভেদ ?

উত্তর—শিখেছি এটি হলো বুদ্ধির বিষয় আর জেনেছি হলো বুদ্ধির প্রকাশক। বুদ্ধির অন্তর্গত হলো শিখেছি এবং জেনেছির অন্তর্গত হলো বুদ্ধি। শেখা জিনিস তো দৃঢ়-অদৃঢ় হয়। কিন্তু জানা জিনিস অদৃঢ় হয় না॥৪৩৫॥

প্রশ্ন—শেখা, বোঝা এবং অনুভব করা—এই তিনটির মধ্যে কী পার্থক্য ?

উত্তর—এইটি নিচের দৃষ্টান্ত থেকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। ছোট শিশু 'শিখে নেয়' যে ইনি হলেন আমার মা। তিনি কেন মা, কেমন করে মা হলেন একথা সে জানে না। সে যখন একটু বড় হয় তখন সে 'বুঝে নেয়' যে ইনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন তাই ইনি আমার মা। বিবাহের পর সে যখন নিজে মা হয়, শিশুর জন্ম দেয় তখন সে অনুভব করে যে এইভাবে মা আমার জন্ম দিয়েছেন॥৪৩৬॥

প্রশ্ন—সিদ্ধান্ত এবং নিয়মের মধ্যে কী প্রভেদ ?

উত্তর—'সিদ্ধান্ত' হলো নির্ধারণ এবং 'নিয়ম' হলো পালন করবার বিষয়॥৪৩৭॥

প্রশ্ন—স্বাভিমান এবং অভিমানের মধ্যে কী প্রভেদ ?

উত্তর—স্বাভিমান হলো সাত্ত্বিক এবং অভিমান হলো তামসিক। আমি সাধক, তাহলে সাধকের বিরুদ্ধ কাজ আমি কী করে করতে পারি ? আমি কী করে চুরি করতে পারি—এটি হলো 'স্বাভিমান'। আমি সাধক, অন্যে সাধক নয়—এই ভাব, অন্য অপেক্ষা নিজেকে বিশিষ্ট মনে করা হলো 'অভিমান'। অভিমান বা অহঙ্কার হলে মানুষ সাধনার বিরুদ্ধ কাজ করে ফেলে। আর স্বাভিমান হলে তাঁর সাধন-বিরুদ্ধ কাজ করতে লজ্জা হবে॥৪৩৮॥

প্রশ্ন—মুমুক্ষা এবং জিজ্ঞাসার মধ্যে কী পার্থক্য ?

উত্তর—মুমুক্ষার মধ্যে সাধক নিজের মুক্তি চান এজন্য তাঁর মধ্যে আমিত্ব ভাব থাকে। মুমুক্ষা অপেক্ষা আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা ভাল এবং আত্মতত্ত্বের পিপাসা থেকে প্রেমের পিপাসা আরও ভাল॥৪৩৯॥

প্রশ্ন—জিজ্ঞাসা স্বয়ং-এ হয়, নাকি বুদ্ধি বা অহং-এ হয় ?

উত্তর—জিজ্ঞাসা স্বয়ং-এ হয়। ভাবরূপ স্বয়ং-এ অনস্তিত্বের অনুভূতি থাকে। তাই জিজ্ঞাসা থাকে। যদি মনে করেন যে জিজ্ঞাসা অহং-এ হয় তাহলে প্রশ্ন হবে অহং-এর মালিক কে ? অহং-এর সঙ্গে কে সম্বন্ধ জুড়েছে ? আমি সেই— এই প্রত্যভিজ্ঞা কার মধ্যে আছে ? মানতে হবে যে স্বয়ং (চেতনা)ই হলো অহং-এর মালিক। সেই অহং-এর সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়েছে এবং তারই মধ্যে প্রত্যভিজ্ঞা হয়ে থাকে। স্বয়ং অহং-এর সঙ্গে যত বেশি ওতপ্রোত হয়েছে, অহং-কে মেনে নিয়েছে, অহং-কে স্বীকার করেছে, তত পরিমাণেই সে অজ্ঞান। স্বয়ং জগতের সত্তা মেনে নিয়েছে '**যয়েদং ধার্যতে জগৎ**' (গীতা ৭।৫)। অতএব স্বয়ং-এ জিজ্ঞাসা হয় এবং স্বয়ং-এ বোধ হয়। বোধ হয়ে গেলে স্বয়ং-এ পার্থক্য দেখা যায়। স্বয়ং-এ পার্থক্য থেকে গেলে মন-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়তেও পার্থক্য দেখা দেয়॥৪৪০॥

প্রশ্ন—সজাগ থাকা ভাল, নাকি উদাসীন থাকা ভাল ?

উত্তর—কর্তব্য পালনে সজাগ থাকবেন আর ভিতরে উদাসীন থাকবেন। উদাসীন থাকার অর্থ হলো—রাগ(আসক্তি)-দ্বেষ থাকবে না, পক্ষপাতিত্ব করবেন না, নিরপেক্ষ থাকবেন ॥৪৪১॥

প্রশ্ন—আগেকার দিনে লোকেরা অন্যায়কে সহ্য করতেন না, কিন্তু আজকাল অন্যায়কে সহ্য করে। অন্যায়কে সহ্য করা কি উচিত ?

উত্তর—অন্যায়কে সহ্য করা উচিত নয়। যে অন্যায় করে সেই অন্যায়কে সহ্য করে— **'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'** ॥৪৪২॥

প্রশ্ন—প্রয়োজনের বস্তু যখন সহজেই পাওয়া যায় তখন অনেক লোক শরীর নির্বাহের বস্তুগুলির অভাব ভোগ করেন কেন ?

উত্তর—তারা পূর্বজন্মে অন্ন, জল প্রভৃতি শরীর-নির্বাহের বস্তুগুলির অপব্যবহার করেছে। সেজন্য তাদের কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। এজন্য এখন তাদের কষ্ট ভোগ করা প্রয়োজন। তাৎপর্য হলো এই যে, যেমন শরীর-নির্বাহের জন্য বস্তুর প্রয়োজন, তেমনই পূর্বকৃত কর্মের ফলভোগ করাও প্রয়োজন। তাই লোকেদের শরীর-নির্বাহের বস্তুগুলির অপব্যবহার, অপব্যয় করা উচিত নয় ॥৪৪৩॥

প্রশ্ন—অখণ্ড স্মৃতি কী ?

উত্তর—'আমি রয়েছি'— এই নিজ সত্তাকে আমরা নিরন্তর অনুভব করি। এইটিই হলো অখণ্ড স্মৃতি। 'আমি রয়েছি'— এটি হলো জ্ঞানের অখণ্ড স্মৃতি এবং 'আমি ভগবানের'— এটি হলো ভক্তির অখণ্ড স্মৃতি। জ্ঞান লাভ হলে 'আমি' থাকে না এবং 'আছি' 'আছে'- তে বদলে যায় ॥৪৪৪॥

প্রশ্ন—অন্যদের নিজের মনে করা এবং তাদের উপেক্ষা করা— এই দুটির মধ্যে কোনটি ভাল ?

উত্তর—নিজের শরীরকে উপেক্ষা করা উচিত এবং অন্যদের শরীরে আপনত্ব থাকা উচিত, অর্থাৎ নিজের শরীরে কষ্ট হলে তাকে যেমন দূর করবার চেষ্টা করা হয় তেমনই অন্যদের শরীরের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করা উচিত। তাৎপর্য হলো, যেমন নিজের শরীরের প্রতি মমত্ব আছে, তেমনই অন্যদের

শরীরের প্রতিও আপনত্ব থাকা চাই। আর যেমন সংসারকে উপেক্ষা করা হয় তেমনই নিজের শরীরকেও উপেক্ষা করতে হবে। অন্যের উপকারের জন্য যথাযোগ্য আচরণ করুণ, কিন্তু আপনত্ব ধরে কোনো পার্থক্য করা উচিত নয়।

জ্ঞানমার্গে ঔদাসীন্য একটি বড় জিনিস আর কর্মযোগে এবং ভক্তিযোগে দয়া বড় জিনিস॥৪৪৫॥

প্রশ্ন—রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির কথাগুলিকে রূপক (কল্পিত) মনে করা, সেগুলিকে লোকাচার মনে করা (যেমন অহঙ্কারের নাম রাবণ ইত্যাদি) কী উচিত ?

উত্তর—ইতিহাসের কথাগুলিকে রূপক করা ঠিক নয়। শাস্ত্রগুলিতে জ্ঞানের কথা তো কম নেই, তাহলে কেন রূপক করা হবে ? কল্পনা বললে ইতিহাস বিকৃত হয়ে যায়, ভগবানের চরিত্রে আঘাত করা হয় ॥৪৪৬॥

প্রশ্ন—কীর্তনে যে সুখ পাওয়া যায় তা কী রকমের ?

উত্তর—কীর্তনে যে সুখ পাওয়া যায় তা সাত্ত্বিক। সেই সুখ ভগবানের দিকে নিয়ে যায়॥৪৪৭॥

প্রশ্ন—একটি কথা বলা হয় যে প্রকৃতি হলো কর্তা। আবার একটি কথা বলা হয় যে পুরুষও কর্তা নয়, প্রকৃতিও কর্তা নয় ; কেউই কর্তা নয়, তা হলো আরোপিত— এই দুটির মধ্যে কোন কথাটি ঠিক ?

উত্তর—বাস্তবে কর্তা কেউ নয়, পুরুষও নয়, প্রকৃতিও নয়। তবে কাউকে যদি কর্তা বলে মানতেই হয় তাহলে এইটিই বলতে হবে যে প্রকৃতি (জড়)-এর মধ্যে কর্তৃত্ব আছে। পুরুষ (চৈতন্য)-এর মধ্যে নেই। তাৎপর্য হলো যদি কর্তা মানতে হয় তাহলে তা আছে প্রকৃতিতে, নইলে কেউই কর্তা নয়॥৪৪৮॥

প্রশ্ন—কর্মের শক্তি কার মধ্যে থাকে ?

উত্তর—প্রকৃতির মধ্যেই ক্রিয়ার শক্তি আছে, কিন্তু তাকে নিজেদের মধ্যে আছে বলে ধারণা করা হয়। শরীরে অধিকার আরোপ করার ফলে নিজের মধ্যে ক্রিয়ার শক্তি আছে বলে মনে হয়॥৪৪৯॥

প্রশ্ন—গঙ্গাকে পূজা করে কী লাভ ?

উত্তর—পূজা করলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ নির্মল হয়। দ্বিতীয় কথা, যার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব আছে তার পূজা স্বাভাবিকভাবেই হয়॥৪৫০॥

প্রশ্ন—জীব তো অনন্ত, তাহলে চুরাশি লক্ষের গণনা কেন করা হবে ?

উত্তর—ঋষিরা জীবের চুরাশি লক্ষ জাতি গণনা করেছিলেন। সেজন্য তাঁরা চুরাশি লক্ষ জীবের কথা বলেছিলেন। চুরাশি লক্ষ জাতির এক একটি জাতির মধ্যে লক্ষ, কোটি প্রজাতি আছে। ভূত, প্রেত, পিশাচ, দেবতা, পূর্ব পিতৃগণ, গন্ধর্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকে গণনার মধ্যে ধরা হয়নি। কেননা এগুলি সবই দেবযোনী। সকলে এগুলিকে সচরাচর দেখতে পায় না॥৪৫১॥

প্রশ্ন—সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে দেব এবং অসুর— এই দুটি বিভাগ কী করে করা হল ?

উত্তর—প্রকৃতি এবং পুরুষ দুটিই অনাদি— **'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি'** (গীতা ১৩।১৯)। প্রকৃতির প্রাধান্যে অসুর হয়েছে এবং পুরুষের প্রাধান্যে দেব হয়েছে।

বাস্তবে সত্তা একটিই। কিন্তু নিজেদের রাগ (আসক্তি)-দ্বেষের কারণে দুটি দেখায়। নিজেদের রাগ-দ্বেষের কারণেই অসুর এবং দেবতার বিভাগ দৃষ্ট হয়। নিজেদের যদি রাগ-দ্বেষ না থাকে তাহলে অসুর এবং দেবতার মধ্যে প্রভেদ কোথায় ? —**'অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন'** (গীতা ৯।১৯)। রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ না থাকলে সবই ভগবানের লীলা, তাঁর খেলা॥৪৫২॥

প্রশ্ন—কিন্তু ভগবানের এই পরস্পরবিরোধী কথাবিশিষ্ট লীলা বোধগম্য হয় না !

উত্তর—লীলাকে বোঝা যায় না, বিশ্বাস করতে হয়। যদি আমরা লীলাকে বুঝতে পারি তাহলে বোঝাটাই বড় হয়ে যাবে এবং ভগবান গৌণ হয়ে যাবেন ! ॥৪৫৩॥

প্রশ্ন—আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে অমুক পুরুষ বা নারীর মধ্যে অমুক দেবী বা দেবতা ভর করেছেন এবং কথা বলছেন। এটি কি সত্য ?

উত্তর—আজকাল ভণ্ডামী অনেক বেড়ে গেছে। যদি শরীরের মধ্যে দেবী-

দেবতার প্রবেশ হয় তাহলে শরীর তাঁর তেজ সহ্য করতে পারে না। মানুষের শরীরে ভূত-প্রেতের প্রবেশ হতে পারে। ভূত-প্রেতের মধ্যে অনেক জাতি আছে। ভূত-প্রেতও দেবযোনির অন্তর্গত। অমরকোষে আছে—

বিদ্যাধরাঽপ্সরোযক্ষরক্ষোগন্ধর্বকিন্নরাঃ।

পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোঽমী দেবযোনিয়ঃ॥ (১।১।১১)॥৪৫৪॥

প্রশ্ন—ধর্মমূলক সিনেমা কি দেখা উচিত?

উত্তর—না, দেখা উচিত নয়। ধর্মীয় সিনেমা দেখলেও ক্ষতি হয়। কেননা ফিল্ম নির্মাতাদের দৃষ্টি পয়সার দিকে এবং সাধারণ লোকের প্রমোদের দিকে থাকে, সত্যের দিকে থাকে না। তাঁরা শাস্ত্রে লিখিত কথাগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝেন না। শাস্ত্রে যা আছে এবং সিনেমাতে যা দেখান হয়— এই দুটির মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণে ধর্মমূলক সিনেমা দেখলে নাস্তিকতা এসে যায়॥৪৫৫॥

প্রশ্ন—কখনও কখনও এমন পরিস্থিতির উদয় হয় যখন কর্তব্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে, পড়ে আমরা কিং কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। সেই সময় কী করা উচিত?

উত্তর—চুপ করে শান্তভাবে ভগবানকে স্মরণ করা উচিত। সমাধান হয়ে যাবে। নিজের স্বার্থত্যাগ এবং অপরের কল্যাণ হবে এমন কাজ করতে হবে॥৪৫৬॥

প্রশ্ন—পিতৃলোক কী?

উত্তর—স্বর্গের মতো এটিও একটি লোক যেখানে আমাদের পূর্বপুরুষেরা থাকেন। যারা সেই লোকের অধিকারী তারা সেখানে যায়—**'পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ'** (গীতা ৯।২৫)

আমাদের পূর্বপুরুষেরা (পিতা, দাদু প্রভৃতি) যে লোকে অথবা যোনিতে আছেন সেটিও পিতৃলোক। পূর্বপুরুষেরা যদি পশুযোনিতে থাকেন তাহলে সেইটিও পিতৃলোক। যাঁদের ঘর-সংসারে বেশি আসক্তি থাকে তাঁরা পিতৃপুরুষরূপে পরিবারের সঙ্গেই সম্বন্ধ রাখেন। তাঁদের উপার্জিত ধন আমরা

নিয়েছি, তাই তাঁদের সেবা করা আমাদের কর্তব্য ॥৪৫৭॥

প্রশ্ন—একনাথ প্রভৃতি সন্তগণ যখন শ্রাদ্ধ-ভোজনের নিমিত্ত পূর্বপুরুষদের আবাহন করেছিলেন তখন তাঁরা সশরীরেই এসেছিলেন, এ কেমন ?

উত্তর—পূর্বপুরুষেরা যে যোনিতে আছেন, আবাহন করলে সেখানে তাঁদের মূর্ছা হয় আর (পরকায়া প্রবেশের মতো) তাঁরা সেখানে উপস্থিত হন। এমন ক্বচিৎ ঘটে থাকে ॥৪৫৮॥

প্রশ্ন—প্রেতেরা যদি কাউকে দুঃখ দেয় তাহলে তাতে তাদের কোনো দোষ (পাপ) হয় কি ?

উত্তর—তাদের কোনো দোষ হয় না, কেননা তারা হলো ভোগযোনি এবং মানুষের ভাগ্য অনুসারে তাঁরা তাদের দুঃখ দেয়। যারা সাত্ত্বিক প্রেত তারা দুঃখ দেয় না। রাজস-তামস প্রেতেরাই দুঃখ দেয়। এইটি হলো নিয়ম যে দুঃখী ব্যক্তিরাই অন্যদের দুঃখ দেয়। সুতরাং যেসব প্রেত নিজেরা দুঃখী তারাই অন্যদের দুঃখ দেয় ॥৪৫৯॥

প্রশ্ন—আমি তো কোনো অন্যায় কাজ করিনি, তাহলেও দুষ্ট লোকেদের আমি ভয় কেন করি ?

উত্তর—নিজের নির্দোষিতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকায় ভয় হয়। ভয় তিনটি কারণে হয়— নিজের আচরণ ঠিক না হলে, নিজের নির্দোষিতার প্রতি বিশ্বাস না থাকলে এবং যে কোনো বস্তুকে (শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি) নিজের মনে করলে ॥৪৬০॥

প্রশ্ন—আমার কিছু নেই, আমার কিছু প্রয়োজন নেই, আমাকে কিছু করতে হবে না— এই তিনটির মূলে কী আছে ?

উত্তর—মূলে আছে— আমি কিছুই নই, পরমাত্মাই আছেন ॥৪৬১॥

প্রশ্ন—বেদ হলো অনাদি (সনাতন) এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিরা পরে এসেছেন। তাহলে বেদে এই সব ঋষির উল্লেখ কী করে করা হয়েছে ?

উত্তর—বেদ হলো সর্বজ্ঞ। ভগবানও বলেছেন— **'বেদাহং সমতীতানি**

বর্তমানানি চার্জুন' (গীতা ৭।২৬)। অতএব ঐ ঋষিদের মাহাত্ম্য প্রকাশ করার জন্য, ব্রহ্মবিদ্যার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বেদগুলি আগে থেকেই তাঁদের বর্ণনা করে রেখেছে। মহর্ষি বাল্মীকিও ভগবান রামের অবতার হওয়ার আগেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন। বাল্মীকি বলেছেন—

ভবিষ্যজ্জ্ঞানযোগাচ্চ কৃতং রামায়ণং শুভম্॥

(পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড ৬৬।১৭)

'ভবিষ্য-জ্ঞান হওয়ার কারণে এই রামায়ণকে আমি আগে থেকেই লিখে রেখেছিলাম' ॥৪৬২॥

প্রশ্ন—বিদ্যা কেবল অর্জন করবে না, তাকে অনুভব কর— এই কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—বিদ্যাকে নিজের এবং অন্যের কাজে লাগান প্রয়োজন। যার বিদ্যা নেই তাকে বিদ্যা দান করা উচিত। কেবল জানার জন্য বিদ্যা অর্জন করলে অহঙ্কার এসে যায়॥৪৬৩॥

প্রশ্ন—স্ত্রীদের ব্রত নিতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু পতিদের জন্য তাঁরা কি ব্রত করতে পারেন ?

উত্তর—স্বামীদের জন্য তাঁরা ব্রত করতে পারেন এবং স্বামীদের আদেশেও তাঁরা তা করতে পারেন। সতী সাবিত্রীও স্বামীর জীবনের জন্য ব্রত করেছিলেন॥৪৬৪॥

প্রশ্ন—আজকাল শত শত বক্তা হয়েছেন এবং লক্ষ লক্ষ লোক তাঁদের কথা শোনেন। তবু লোকের আচরণের কোনো সংশোধন হয়নি কেন ?

উত্তর—তার কারণ বক্তারা নিজেরাই যেমন বলেন তেমন আচরণ করেন না। নিজেরা সেরকম আচরণ করলে তার প্রভাব পড়ে। শ্রোতাদের মধ্যে জানার আগ্রহ থাকে না। জিজ্ঞাসা থাকলে লাভ হয়, কেবল শুনে গেলে লাভ হয় না॥৪৬৫॥

প্রশ্ন—শাস্ত্রে ভগবৎ কথার বক্তা এবং শ্রোতা উভয়কেই দুর্লভ বলা হয়েছে। কিন্তু আজকাল এদের দুজনকেই খুব সুলভ দেখা যাচ্ছে। এর কারণ কী?

উত্তর—তার কারণ এই দুই-ই নকল ॥৪৬৬॥

প্রশ্ন—শুকদেব বার বছর গর্ভে ছিলেন কী করে ?

উত্তর—গর্ভের মধ্যে যতটা আকার তাঁর শরীরের আকার ততটাই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধি (অন্তঃকরণ) বিকশিত হয়েছিল। জন্মের পরে তাঁর শরীর ধীরে ধীরে নিজের স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়েছিল ॥৪৬৭॥

প্রশ্ন—শ্রদ্ধা অন্ধ হয়। কিন্তু তাতে যদি প্রবঞ্চনা থাকে ?

উত্তর—সত্যকার শ্রদ্ধাভাজনের সঙ্গে প্রবঞ্চনা হতে পারে না। তাঁর দুঃখ হতে পারে, কিন্তু তাঁর ক্ষতি হয় না। সীতা সাধুরূপধারী রাবণকে এবং হনুমান কালনেমিকে শ্রদ্ধা করেছিল তাতে তাঁর কী ক্ষতি হয়েছিল ? ক্ষতি তো হয়েছিল রাবণ এবং কালনেমির ॥৪৬৮॥

প্রশ্ন—শ্রাদ্ধের অন্ন গ্রহণ করা উচিত, না উচিত নয় ?

উত্তর—ঘরের লোকেরা যদি শ্রাদ্ধের অন্ন খান তো তাতে কোনো দোষ নেই। কেননা মৃত ব্যক্তি তাঁদেরই আপনজন ছিলেন। কিন্তু অন্য লোকের কিছুতেই খাওয়া উচিত নয়। অন্ন যদি উদ্বৃত্ত হয় তাহলে পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করে তিনি যেমন বলবেন সেই রকমই করবেন। মৃত্যুর পর তৃতীয় এবং দ্বাদশ দিনের অন্ন খুবই অশুদ্ধ হয়। সেজন্য উদ্বৃত্ত অন্ন মাটিতে পুঁতে দেওয়া উচিত। বাৎসরিক পিতৃপক্ষে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধের অন্নও অন্য লোকের খাওয়া ঠিক নয়। শ্রাদ্ধের ভোজন ব্রাহ্মণদের খাওয়ানোর জন্য বলা হয়েছে, গরীবদের নয় ॥৪৬৯॥

প্রশ্ন—প্রাপ্ত বস্তুর সদ্ব্যবহার কীভাবে করব ?

উত্তর—বস্তুকে নিজের মনে করবে না এবং প্রয়োজন দেখলে সেই বস্তুকে অন্যের সেবায় লাগাবে ॥৪৭০॥

প্রশ্ন—কারও মধ্যে যদি ছোটবেলা থেকে খারাপ স্বভাব থাকে তাহলে তাকে কী করে দূর করা যাবে ?

উত্তর—প্রথমে মেনে নেবে যে স্বভাবটা খারাপ এবং তা অবশ্যই দূর হবে। তারপর সৎবিচার করবে, সৎ-শাস্ত্র পড়বে এবং সৎসঙ্গ করবে।

সদ্বিচার, সৎ-শাস্ত্র এবং সৎসঙ্গের দ্বারা স্বভাব শুধরাতে পারে, শুদ্ধ হতে পারে ॥৪৭১॥

প্রশ্ন—মা সীতা মৃগচর্মের জন্য স্বর্ণমৃগকে মারবার জন্য কেন বলেছিলেন ?

উত্তর—হরিণকে মারতে মাতা সীতা বলেননি, বলেছিলেন ছায়া সীতা। সীতাও ছিলেন ছায়া এবং হরিণটিও ছিল ছায়া। ছায়া সীতা সোনার প্রতি লোভ করেছিলেন আর তাই ভগবান তাঁকে সোনার লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে অন্তরীণ করেছিলেন। মাতা সীতার সতীত্বের এত বেশি তেজ ছিল যে দুরভিসন্ধি নিয়ে স্পর্শ করা মাত্র রাবণ ভস্ম হয়ে যেত ! ॥৪৭২॥

প্রশ্ন—ছোটবেলার কোনো কোনো কথা মনে থাকে আবার দুদিন আগের কোনো কোনো কথা মনে থাকে না— এর কী কারণ ?

উত্তর—কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, হর্ষ, শোক, দয়া প্রভৃতি ভাবে হৃদয় বিগলিত হয়।[১] সেই বিগলিত হৃদয়ে স্থায়ী হওয়া কথা ভোলে না। যে কথায় হৃদয় বিগলিত হয় না সেই কথার বিস্মরণ ঘটে॥৪৭৩॥

প্রশ্ন—বর্তমানকালে হিন্দুদের মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের অপেক্ষা পশ্চাদপদ কেন মনে হয় ?

উত্তর—নিজেদের ঘরের ফাঁক-ফোঁকরগুলি তো আমরা জানি, কিন্তু মুসলমান-খ্রীষ্টানদের ঘরের ফাঁকগুলি আমরা জানি না, তাই এমন মনে হয়। বাস্তবে নৈতিক পতন সকল ধর্মাবলম্বীদেরই হয়েছে। ঐসব ধর্মের প্রধানদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন যে তাঁদের নতুন প্রজন্মের যুবকেরা কী রকম। দ্বিতীয় কথা, হিন্দুধর্ম কলিযুগের বিপরীত, কিন্তু তাঁদের ধর্ম কলিযুগের কিছুটা অনুকূল। সেজন্য তাঁরা কলিযুগ থেকে কিছুটা সহায়তা লাভ করেন। এই সব কথা ছাড়াও সরকারী আইন আমাদের ধর্মের উন্নতিতে বাধাস্বরূপ।

---

[১]কামক্রোধভয়স্নেহহর্ষশোকদয়াঽহৃদয়ঃ।
তাপকাশ্চিত্তজতুনস্তচ্ছান্তৌ কঠিনং তু তৎ॥ (ভক্তিরসায়ন ১।৫)

কলিযুগে ধর্ম সমষ্টিগত না হয়ে ব্যক্তিগত হয়ে থাকে। যেমন, সকল ব্রাহ্মণ যেন নিজেদের ধর্মপালন করেন, এমন হয় না। আবার কোনো ব্রাহ্মণই নিজের ধর্মপালন করে না, এমনও হয় না। এজন্য সাধুপুরুষগণ বলেছেন—

তেরে ভাবৈ জো করৌ, ভলো বুরো সংসার।
'নারায়ন' তূ বৈঠ কে, অপনো ভবন বুহার॥৪৭৪॥

প্রশ্ন—বিষ্ণুর ধ্যান করবার সময় যদি শঙ্কর ধ্যানে এসে যান তাহলে কী করা উচিত ?

উত্তর—বিষ্ণুই নিজের ইচ্ছায় শঙ্কররূপে এসেছেন, এমন মনে করে প্রসন্ন থাকবেন । শুধু তাই নয়, যদি কোনো সাংসারিক বস্তু বা ব্যক্তিও ধ্যানে এসে যায় তাহলে এমন কথা মনে করবেন যে ভগবানই সেই রূপ নিয়ে এসেছেন। তাৎপর্য হলো, ধ্যানে যে কেউ আসুন না কেন তাকে নিজের ইষ্টের রূপ বলে মেনে নেওয়া উচিত— **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** ॥৪৭৫॥

প্রশ্ন—ভক্ত ভগবানের ধ্যান করেন আবার ধ্যানযোগীও করেন। তাহলে ধ্যানযোগী 'চঞ্চলমনা' (যোগভ্রষ্ট) কী করে হন ?

উত্তর—ধ্যানযোগীর সাধ্য তো ভগবান কিন্তু তার সাধন হলো বৃত্তি নিয়োগ করা। অন্য দিকে ভক্তের সাধনও ভগবান এবং সাধ্যও ভগবান॥৪৭৬॥

প্রশ্ন—প্রকৃতির যখন সত্তাই নেই তখন শাস্ত্রে প্রকৃতিকে অনাদি কেন বলা হয়েছে ?

উত্তর—আমরা প্রকৃতির সত্তা মানি, অস্তিত্ব স্বীকার করি এজন্য শাস্ত্র আমাদের ভাষাতেই কথা বলে। দৃষ্টিভেদে দর্শন অনেক, তত্ত্ব একটিই। যেখানে দ্রষ্টা, দৃষ্টি এবং দৃশ্য নেই, সেখানে ভেদ নেই। দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, দার্শনিক, দর্শন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ভেদ আছে। এর পরে তত্ত্বে কোনো ভেদ নেই॥৪৭৭॥

প্রশ্ন—পরমাত্মাও অনন্ত এবং প্রকৃতিও অনন্ত— এই দুটি কথা কেমন? প্রকৃতি তো পরমাত্মারই একটি অংশ।

উত্তর—দুটির অনন্ততায় প্রভেদ আছে। পরমাত্মা অপার-অসীম, এজন্য

তিনি অনন্ত। প্রকৃতি নষ্ট হয় না— এজন্য তা অনন্ত। **'কৃতার্থং প্রতি নষ্ট-মপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ'** (যোগদর্শন ২।২২)॥৪৭৮॥

প্রশ্ন—মনের নিবাস কোথায় ?

উত্তর—মনের নিবাস জাগ্রত অবস্থায় নেত্রে, স্বপ্নাবস্থায় 'হিতা' নাড়িতে, সুষুপ্তি অবস্থায় 'পুরীততী' নাড়িতে। জাগ্রত অবস্থায় সকল বস্তুর জ্ঞান নেত্রে থাকে এবং নেত্রের দ্বারাই মনের কথা প্রকাশ হয়। অন্ধ মানুষের নেত্রের শক্তি কর্ণে চলে যায়॥৪৭৯॥

প্রশ্ন—মানুষের বন্ধনের কারণ কি মন ?

উত্তর—মন মানুষের বন্ধন বা মুক্তির কারণ নয়। নিজের মধ্যেই বন্ধন আর মুক্তিও নিজেরই মধ্যে। মনের মধ্যে কোন দোষ ছিল না, নেই, থাকবে না, থাকতে পারে না। তার কারণ মন হলো একটি করণ (যন্ত্র)। করণ কখনও স্বতন্ত্র হয় না, তা থাকে কর্তার অধীন। দোষ তো কর্তার হয়, করণের কী দোষ ? লেখকের দোষ থাকে, কলমের কী দোষ ? কর্তার দোষই করণে বর্তায়। কর্তায় যদি দোষ না থাকে তাহলে করণে দোষ আসতেই পারে না। অতএব নিজের দোষই মনে দেখা যায়। মন তো দর্পণ। অ-সতের ধারণা নিজের মধ্যেই বর্তমান॥৪৮০॥

প্রশ্ন—ধূমপান প্রভৃতি ব্যসনে লিপ্ত কোনো কোনো মানুষ তাড়াতাড়ি রোগগ্রস্ত হয় আবার কেউ কেউ রোগগ্রস্ত হয় না, এর কী কারণ ?

উত্তর—শরীরের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় কাউকে কাউকে রোগ তাড়াতাড়ি আক্রমণ করে, কাউকে করে না। কিন্তু ব্যসন যেমনই হোক, তার প্রভাব তো থাকেই, সেই প্রভাব থেকে কেউ রেহাই পেতে পারে না॥৪৮১॥

প্রশ্ন—চিকিৎসায় কি কেবল ব্যাধি দূর হয়, নাকি আয়ুও বৃদ্ধি হয় ?

উত্তর—চিকিৎসায় কেবল ব্যাধি দূর হয়, আয়ু বৃদ্ধি হয় না। আয়ু সম্পূর্ণ হলে তবেই মানুষের মৃত্যু হয় , তার আগে নয়। কোনো বড় অসুখ সত্ত্বেও যদি ভাগ্যে আয়ু শেষ না হয়ে থাকে তাহলে কোনো না কোনো উপায় এসে যাবে যাতে অসুখ দূর হয়ে যাবে, নয়তো রোগগ্রস্ত থেকেও সে বেঁচে থাকবে।

চিকিৎসায় কুপথ্যজনিত রোগ দূর হয়, ভাগ্যজনিত রোগ দূর হয় না॥৪৮২॥

প্রশ্ন—না চাইতেও যদি অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতার প্রভাব পড়ে তাহলে কী করব ?

উত্তর—তাকে গ্রাহ্য করবে না। এইটি দেখবে যে সেই প্রভাব সর্বদা এবং একই রকম আছে কিনা । বাস্তবে প্রভাব মন-বুদ্ধির উপর পড়ে। কিন্তু মন-বুদ্ধিকে নিজের বলে মনে করায় অজ্ঞানবশে আমরা সেই প্রভাবকে আমাদের বলে মেনে নিই॥৪৮৩॥

প্রশ্ন—আমাদের সংস্কৃতির উপর বিদেশী প্রভাব বেশি কেন পড়ে ?

উত্তর—হিন্দু সংস্কৃতি সাদা কাপড়ের মতো স্বচ্ছ। এজন্য এর উপর অন্য রং তাড়াতাড়ি লেগে যায়। অর্থাৎ অন্যের কথা এ তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে নেয়॥৪৮৪॥

প্রশ্ন—নিজেদের এঁটো খাবার কি পশু-পাখিকে দেওয়া যায় ?

উত্তর—হ্যাঁ দেওয়া যায়। তবে গরুকে দেওয়া উচিত নয়॥৪৮৫॥

প্রশ্ন—জলের কলে সর্বত্র চামড়ার ওয়াশার লাগান হয়। তাহলে জলকে কী করে ব্যবহার করা যাবে ?

উত্তর—যেখানে নিরুপায় অবস্থা, জল ছাড়া বাঁচবার কোনো উপায় থাকে না সেখানে জীবন নির্বাহের দোষ হয় না—**'শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্'** (গীতা ৪।২১)॥৪৮৬॥

প্রশ্ন—শিবনির্মাল্যকে ত্যাজ্য বলে মানা হয়েছে। শিবনির্মাল্য কী ?

উত্তর—শিবলিঙ্গের উপর রাখা জিনিস হলো শিবনির্মাল্য। যে জিনিস শিবলিঙ্গের উপর চাপান নেই তা শিবনির্মাল্য নয়। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গে শিবলিঙ্গের উপর চাপান জিনিসকে শিবনির্মাল্য মানা হয় না॥৪৮৭॥

প্রশ্ন—অন্ন কী করে শুদ্ধ হয় ?

উত্তর—খাদ্যবস্তু সাত্ত্বিক হলে, শুদ্ধ উপার্জনের হলে, পবিত্রতার সঙ্গে প্রস্তুত করা হলে এবং ভগবানকে অর্পণ করবার পর গ্রহণ করা হলে সেটি শুদ্ধ॥৪৮৮॥

প্রশ্ন—ভূত-প্রেতকে তাড়াবার কাজ যারা করে তাদের কি দুর্গতি হয় ?

উত্তর—দুর্গতি তখনই হয় যখন ভূত-প্রেতকে কষ্ট দেওয়া হয়, যেমন তাদের বেঁধে রাখা, বোতলে বন্দী করা প্রভৃতি। অতএব গয়াশ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিয়ে তাদের সদ্‌গতি করান উচিত। তাতে তাদেরও ভাল হবে এবং তারও ভাল হবে যাকে প্রেত ধরেছে। এই রকম ভাবে তাদের হিতের দিকে দৃষ্টি থাকলে দুর্গতি হয় না॥৪৮৯॥

প্রশ্ন—সত্যনারায়ণ কথা কী ?

উত্তর—কেবল কাহিনীকেই 'কথা' বলা হয় না। প্রত্যুত শাস্ত্রার্থ, বাক্য-প্রবন্ধ প্রভৃতিকেও 'কথা' বলা হয়। সত্যনারায়ণ ভগবানের ব্রত। পূজা এবং তার বিধি-বিধানের বর্ণনাকেও 'কথা' বলা হয়। প্রথমে যিনি সত্যনারায়ণের ব্রত-পূজা কথা করেছিলেন, পরবর্তীকালের লোকেরাও তাঁর জীবন-গাথা বলতে শুরু করেছিলেন॥৪৯০॥

প্রশ্ন—বাড়িতে মহাভারত এবং গরুড় পুরাণও কি রাখা যেতে পারে ?

উত্তর—অবশ্যই রাখা যেতে পারে। বাড়িতে মহাভারত এবং গরুড় পুরাণ রাখায় এবং পাঠ করায় কোন দোষ নেই॥৪৯১॥

প্রশ্ন—অভিশাপ এবং বরপ্রদানে যে কাজগুলি হওয়ার সেগুলিই হয়, নাকি নতুন কাজও হয় ?

উত্তর—অভিশাপ এবং বরদানে বিশেষ শক্তি (তপোবল) থাকে। তার দ্বারা যা হওয়ার নয় এমন কাজও হতে পারে। এমন অভিশাপ-বরদান কেবল মুনি ঋষিদের দ্বারাই হয় না, সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে, কেননা অভিশাপ-বরপ্রদানের পিছনে বিশেষ দুঃখ বা বিশেষ প্রসন্নতা থাকে। কিন্তু কোন্ ঘটনা অভিশাপ-বরদানে হয়েছে অথবা হওয়ার ছিল বলে হয়েছে তা সম্পূর্ণত বোঝা যায় না।

শাপ-বরদানে স্বভাব নষ্ট হয় এবং পারমার্থিক পুণ্যের ক্ষতি হয়। এজন্য অপরকে শাপ বা বর দেওয়া উচিত নয়॥৪৯২॥

প্রশ্ন—শান্তি কী করে পাওয়া যায় ?

উত্তর—কামনা ত্যাগ করলে শান্তি পাওয়া যায়। অতএব আমি যেমন চাই তেমনই হয়ে যাবে এবং যা চাই তাই পেয়ে যাব— এই কামনা ত্যাগ করা উচিত॥৪৯৩॥

প্রশ্ন—ত্যাগ করলে শান্তি পাওয়া যায় 'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্' (গীতা ১২।১২), ত্যাগের আগেও কি শান্তি পাওয়া যায় ?

উত্তর—হ্যাঁ, উদ্দেশ্য হওয়া মাত্র শান্তি পাওয়া যায়। আমাদের কেবল ভজন করতে হবে, আর কিছু করতে হবে না— এমন নিশ্চয় করলেই সংশয় দূর হয়ে যায় এবং শান্তি পাওয়া যায়॥৪৯৪॥

প্রশ্ন—প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার কেমন করে করব ?

উত্তর—পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার হলো অনুকূল পরিস্থিতিতে অন্যের সেবা করা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজের ইচ্ছাকে ত্যাগ করা। প্রধান কথা হলো সব পরিস্থিতিকেই ভগবানের ইচ্ছা মনে করা। সেই পরিস্থিতি যদি নিজের কর্ম ফল হয় তাহলেও তা ভগবানের ইচ্ছা, যদি সংসার থেকে পাওয়া হয় তবে তাও ভগবানের ইচ্ছা, যদি ভগবানের বিধান হয় তবে তাও ভগবানের ইচ্ছা॥৪৯৫॥

প্রশ্ন—আমরা ভজন-ধ্যান করছি এবং পাশে শোরগোল হচ্ছে— এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার কেমন করে করব ?

উত্তর—একে ভগবানের ইচ্ছা মনে করতে হবে এবং তা শুনে প্রসন্ন থাকতে হবে। যদি এমন পরিস্থিতিতে ভজন ধ্যান করতে না পারা যায় তবে তার দায় আমাদের নয়। আমাদের দায়িত্ব ততটাই যতটা আমরা করতে পারি॥৪৯৬॥

প্রশ্ন—সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে ?

উত্তর—যার অহং সম্পূর্ণভাবে দূর হয়েছে অর্থাৎ যার **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** এর অনুভূতি হয়ে গিয়েছে॥৪৯৭॥

প্রশ্ন—সর্বোৎকৃষ্ট অনুভূতি কী ?

উত্তর—আমার কেবল ভগবানই আছেন, ভগবান ছাড়া আর কেউ

নেই—এই অনুভূতি॥৪৯৮॥

প্রশ্ন—বাস্তবে নিজের জিনিস কী ?

উত্তর—নিজের জিনিস সেইটিই যা সর্বদা সঙ্গে থাকবে, কখনও বিচ্ছেদ হবে না। যে জিনিস প্রাপ্ত হয়েছে এবং বিচ্ছেদ হবে তা কখনই নিজের এবং নিজের জন্য হতে পারে না। শরীর, বস্তু, যোগ্যতা এবং সামর্থ্য আমরা পেয়েছি এবং সেগুলি একদিন থাকবে না। এজন্য এগুলি আমাদের এবং আমাদের জন্য নয়। ভগবান সর্বদা সঙ্গে থাকেন এবং কখনও বিচ্ছেদ হয় না, এজন্য তিনি আমাদের এবং আমাদের জন্য॥৪৯৯॥

প্রশ্ন—শেষ কথা কী ?

উত্তর—এক চিন্ময় সত্তা ছাড়া আর কিছুই নেই॥৫০০॥

~~○~~

॥ শ্রীহরিঃ ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বইয়ের সূচিপত্র

কোড নং

(১) 1118 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে**
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা
গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ ব্যাখ্যা

(২) 763 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।

(৩) 1577 **শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথম খণ্ড)**

(৪) 1744 **শ্রীমদ্ভাগবত (দ্বিতীয় খণ্ড)**

(৫) 1574 **সংক্ষিপ্ত মহাভারত (প্রথম খণ্ড)**

(৬) 1660 **সংক্ষিপ্ত মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড)**

(৭) 1662 **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**

(৮) 556 **গীতা-দর্পণ**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৯) 13 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**
অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থসহ সরল অনুবাদ।

(১০) 496 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**
মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(১১) 1736 **গীতা প্রবোধনী** (লেখক—স্বামী রামসুখদাস)

(১২) 1393 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (বোর্ড বাইন্ডিং)

(১৩) 1444 **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**
অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

কোড নং

(১৪) 395 গীতা-মাধুর্য

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

(১৫) 1851 গীতা রসামৃত

(১৬) 1901 সাধন-সমর বা দেবী মাহাত্ম্য

(১৭) 1937 শিবপুরাণ

(১৮) 1455 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (লঘু আকারে)

(১৯) 1883 শ্রীশ্রীরামচরিতমানস (তুলসীদাসী রামায়ণ)

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত, অখণ্ড সংস্করণ, সম্পূর্ণ নতুনরূপে অনূদিত।

(২০) 275 মানুষ কর্ম করায় স্বাধীন, নাকি পরাধীন ?

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধনপথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

(২১) 1456 ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

(২২) 1469 সর্বসাধনার সারকথা

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(২৩) 1119 ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

(২৪) 1305 প্রশ্নোত্তর মণিমালা

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

(২৫) 1102 অমৃত-বিন্দু

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

(২৬) 1115 তত্ত্বজ্ঞান কীভাবে হবে ?

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

(২৭) 1925 ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মহত্ত্ব

(২৮) 1936 ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস

কোড নং

(২৯) 1358 **কর্ম রহস্য**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

ভগবান গীতায় বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'**—সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(৩০) 1122 **মুক্তিলাভের জন্য গুরুকরণ কি অপরিহার্য ?**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

গুরু-বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্যই পড়া কর্তব্য।

(৩১) 276 **পরমার্থ পত্রাবলী**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধকগণের উদ্দেশে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(৩২) 816 **কল্যাণকারী প্রবচন**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সাধকগণের উদ্দেশে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

(৩৩) 1460 **বিবেক চূড়ামণি** (মূলসহ সরল টীকা)

শ্রীমৎ শংকরাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(৩৪) 1454 **স্তোত্ররত্নাবলী**

প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(৩৫) 1603 **উপনিষদ্**

(৩৬) 1604 **পাতঞ্জলযোগ**

(৩৭) 903 **সহজ সাধনা**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সাধনপথের সহজতম দিক্-দর্শন।

(৩৮) 312 **আদর্শ নারী সুশীলা**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত।

(৩৯) 1415 **অমৃত-বাণী**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৪০) 1541 **সাধনার দুটি প্রধান সূত্র**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(৪১) 1478 **মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

বিভিন্ন সাধন-মার্গের নির্বাচিত ২০টি প্রবচনের এক অমূল্য সংগ্রহ।

কোড নং

(৪২) 1651 **হে মহাজীবন ! হে মহামরণ !!**
স্বামী রামসুখদাস মহারাজের স্বপ্রসঙ্গের নির্দেশাবলী।

(৪৩) 1306 **কর্তব্য সাধনায় ভগবৎপ্রাপ্তি**
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৪৪) 955 **তাত্ত্বিক-প্রবচন**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(৪৫) 428 **আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন**
লেখক— স্বামী রামসুখদাস

(৪৬) 296 **সৎসঙ্গের কয়েকটি সারকথা**

(৪৭) 1359 **পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি**

(৪৮) 1884 **ঈশ্বর লাভের বিবিধ উপায়**

(৪৯) 1303 **সাধকদের প্রতি**

(৫০) 1579 **সাধনার মনোভূমি**

(৫১) 1580 **অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়**

(৫২) 1581 **গীতার সারাৎসার**

(৫৩) 1452 **আদর্শ গল্প সংকলন**

(৫৪) 1453 **শিক্ষামূলক কাহিনী**

(৫৫) 1513 **মূল্যবান কাহিনী**

(৫৬) 625 **দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম**

(৫৭) 956 **সাধন এবং সাধ্য**

(৫৮) 1996 **স্তুতি**

(৫৯) 1293 **আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য**

(৬০) 450 **ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি**

(৬১) 449 **দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব**

(৬২) 451 **মহাপাপ থেকে বাঁচুন**

(৬৩) 443 **সন্তানের কর্তব্য**

(৬৪) 469 **মূর্তিপূজা**

(৬৫) 849 **মাতৃশক্তির ঘোর অপমান**

(৬৬) 1319 **কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা**

(৬৭) 1742 **শরণাগতি**

(৬৮) 762 **গর্ভপাতের পরিণাম ? একবার ভেবে দেখুন**

(৬৯) 1075 **ওঁ নমঃ শিবায়**

(৭০) 1043 **নবদুর্গা**

(৭১) 1096 **কানাই**

	কোড নং	
(৭২)	1097	গোপাল
(৭৩)	1098	মোহন
(৭৪)	1123	শ্রীকৃষ্ণ
(৭৫)	1292	দশাবতার
(৭৬)	1439	দশমহাবিদ্যা
(৭৭)	1652	নবগ্রহ
(৭৮)	1787	মহাবীর হনুমান
(৭৯)	1495	ছবিতে চৈতন্যলীলা
(৮০)	1888	জয় শিব শংকর
(৮১)	1889	স্বনামধন্য ঋষি-মুনি
(৮২)	1891	রামলালা
(৮৩)	1892	সীতাপতি রাম
(৮৪)	1893	রাজা রাম
(৮৫)	1977	ভগবান সূর্য
(৮৬)	330	ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৮৭)	1496	পরলোক ও পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা
(৮৮)	1659	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম
(৮৯)	1881	হনুমানচালীসা (মূলপাঠ, অর্থসহ)
(৯০)	1880	হনুমানচালীসা (মূলপাঠ)
(৯১)	1852	রামরক্ষাস্তোত্র
(৯২)	1356	সুন্দরকাণ্ড
(৯৩)	1322	শ্রীশ্রীচণ্ডী
(৯৪)	1743	শ্রীশিবচালীসা
(৯৫)	1785	ভাগবতের মণিমুক্তা
(৯৬)	1786	মূল শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয়রামায়ণম্‌
(৯৭)	1795	মনকে বশ করার কয়েকটি উপায় ও আনন্দের তরঙ্গ
(৯৮)	1784	প্রেমভক্তিপ্রকাশ, ধ্যানাবস্থায় প্রভুর সঙ্গে বার্তালাপ
(৯৯)	1797	স্তবমালা
(১০০)	1835	সত্যনিষ্ঠ সাহসী বালক-বালিকাদের কথা
(১০১)	1834	শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (মূল) ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম
(১০২)	1839	কৃত্তিবাসী রামায়ণ
(১০৩)	1838	জীবন যাপনের শৈলী
(১০৪)	1853	আমাদের লক্ষ্য ও কর্তব্য
(১০৬)	1854	ভাগবত রত্নাবলী
(১০৬)	1920	আহার নিরামিষ না আমিষ ? সিদ্ধান্ত নিজেই নিন
(১০৭)	1946	রামায়ণ মহাভারতের কতিপয় আদর্শ চরিত্র
(১০৮)	1948	এর নাম কি উন্নতি, না ধ্বংস ?—একটু ভেবে দেখুন
(১০৯)	1978	ভগবানের পাঁচটি নিবাসস্থল

প্রশ্ন—যখন ভাগ্যানুসারেই ধন লাভ হয় তাহলে উদ্যোগ কেন করব ?

উত্তর—উদ্যোগ করা আমাদের কর্তব্য— এইরকম মনে করেই করা উচিত। মানুষের নিজেদের কর্তব্য পালন করা উচিত। ভগবানের আদেশও আছে— **'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'** (গীতা ২।৪৭) 'তোমার অধিকার কেবল কর্তব্য করাতে, ফলেতে নয়'। মানুষ যদি কর্তব্য কর্ম না করে তাহলে তার শাস্তি হবে। কর্তব্য কর্ম করলে তখনই শান্তি লাভ হবে আর না করলে তখনই অশান্তি ॥১৫১॥

—এই বই-এর উদ্ধৃতি